সাক্ষী অগ্নি তুমি আমি

পরিবেশক

সাহিত্যশ্রী

৭৩, এম. জি. রোড

কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ শুভ অক্ষয়তৃতীয়া ১৩৭১

প্রকাশক
শ্যামলকুমার ঘোষ
ঘোষ পাবলিশিং কনসার্ন
৮৯, পটুয়াপাড়া লেন
শ্রীরামপুর হুগলী

মুদ্রক
মৃণালকান্তি রায়
রাজলক্ষ্মী প্রেস
৩৮সি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ—ভক্তিময় লাহিড়ী

সাক্ষী অগ্নি

(১)

দৃশ্যটা কোনোদিনই চোখে পড়েনি। অথচ রোজ এখান দিয়েই ফিরি। বাবুঘাটে নেমে সোজা জেটিতে। তারপর লঞ্চে উঠে ওপারে হাওড়া স্টেশনের দিকে যাই। ব্যাপারটা এত সড়গড় হয়ে গেছে যে মনে হয় পা দুটো যেন গেট থেকে লঞ্চ অবধি আপনা হতেই চলতে থাকে। কি আশ্চর্য! এতদিন এতভাবে শুনেছি কিন্তু নিজের থেকে খেয়াল করে দেখিনি। আজ দেখলাম। বিরাট একটা অগ্নিকুণ্ড যেন তার শেষ রঙ ছড়াতে ছড়াতে সোজা নেমে যাচ্ছে দিকচক্রবালের শেষের বিন্দুতে। আশপাশের কোলাহল, পিছন থেকে ধেয়ে আসা মানুষের ভীড় কোনটাই ঠিক ঠাওর করতে পারছি না। খানিকটা অনামনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। মনে ভীড় করে আসে কত স্মৃতি। ওপর থেকে সাইরেন-এর ঘন্টার শব্দ আর লঞ্চ ছাড়ার বাঁশি এক ঝটকায় মনকে নিয়ে গেল আরেক জেটিতে। যেখানে দাঁড়িয়ে শুনেছিলাম নিলয়ের কথা। জীবননদীর বান কিভাবে ভেঙে চুরমার করেছিল তার ইমারতকে। সব বাঁধকে প্লাবনে ভাসিয়ে কেড়ে নিয়েছিল বাঁচার শেষ ইচ্ছেটুকুও। তারপর যতদিন ও বেঁচে ছিল, তা যেন শুধু মৃত্যুর অপেক্ষা। এই অঙ্কটা আমি কিছুতেই মেলাতে পারিনি। জানি অঙ্কের হিসাবে জীবন চলে না। কোন ফরমুলার মধ্যেই আটকে রাখা যায় না তাকে। তবুও তো আশাকরি। ভাবি, প্রার্থনা করি তাঁর কাছে। হয়তো মনে মনে হাসেন তিনি। মানুষের মন আর প্রবৃত্তির এত বিচিত্র গতিপথ তিনি তৈরী করেছেন যে তার সামগ্রিক হিসাব বোধহয় তাঁর খাতাতেও ধরে না। একের পর এক জন্মের পাপপূণ্যের হিসাব আর প্লাস মাইনাসের এই সুপার ম্যাথামেটিকস্ এক পুতুলনাচের মঞ্চে অদৃশ্য দড়ির টানে নাচায় শুধু। তাই অনেক হিসাবই গরমিল হয়ে যায়। দুই আর দুই-এ চারের জায়গায় পাঁচ ছয় এমনকি দশও হতে দেখি। কি অমোঘভাবে নেমে আসে একটা পরিপূর্ণ সংসারের ছেদ। আগুনের আরেক নাম পাবক। সব পাপকে তার লেলিহান শিখায় পুড়িয়ে নিবষ্ট করে সে। কিন্তু সবটাকে পারে না মনে হয়। তা নয়তো যে অগ্নিকে সাক্ষী করে মিলিকে গ্রহণ করেছিল নিলয় সেটাই পরে নিয়তির কষাঘাত হয়ে দাঁড়াবে কেন।

স্কুলজীবনের অন্যান্য বন্ধুবান্ধব অনেক থাকলেও নিলয়ের সঙ্গেই আমার

সখ্য বেশ নিবিড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। খোলামনের অধিকারী নিলয়ের স্বভাবটাই এত সুন্দর ছিল যে তাকে ভাল না বেসে পারা যেত না। ও ছিল এন. সি. সি.-র পুরুষ উইংস-এর ক্যাপ্টেন। ছেলেবেলা থেকেই চেহারাটা একটু ভারীর দিকে। তবে ঠিক মেদবহুল বলা যায় না। ওর স্ট্রাকচারের সাথে এমন মানিয়ে যেত, যে বেসামাল মনে হতো না একটুও।

চলন্ত ট্রেনের কামরার ভিতর থেকে বাইরে তাকিয়ে যেমন মনে হয়। দৃশ্যগুলো যেন প্রচণ্ড গতিতে পিছনে সরে যাচ্ছে। সরে যাচ্ছে জীবনের ফেলে আসা দৃশ্যের স্মৃতি বিস্মৃতির পাতলা পরদাটুকু। রেলগাড়ীর ব্রেক মারার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা ঝুঁকে পড়ে সামনের দিকে। পায়ে বেঁধা কাঁটা টেনে বার করা যায়। কিন্তু মরমে বেঁধা কাঁটা তো বার করার কোনো উপায় নেই। আপাতসাদৃশ্য না থাকলেও উপমাটা আমার বারাবার মনে পড়ে।

হন্তদন্ত হয়ে আসছিল নিলয়। মুখে উত্তেজনার ছাপ স্পষ্ট। আমায় দেখতে পেয়েই দ্রুত গতিতে এগিয়ে এল। হাতটা চেপে ধরে বলল, কাল সারারাত ছটফট করেছি। খবরটা তোকে জানাতে না পারা পর্যন্ত ভাল করে ঘুমও হলো না।

জিজ্ঞাসা করি, কি খবর? হাঁফাচ্ছিস কেন?

নিলয় বলে, আরে! এবার এন. সি. সি.-র পক্ষ থেকে দিল্লীতে সেন্ট্রাল র‍্যালী প্রোগাম। জহরলাল নেহেরু এবং বি. পি. কৈরালা থাকবেন। আমাদের কাছ থেকে অভিবাদন নেবেন।

— নেহেরু তো বুঝলাম। কিন্তু কৈরালাকে কেন?

— কেন মানে! নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলে ব্যাপার। আফটার অল পৃথিবীর একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্রের প্রধান তো বটে।

— কিন্তু তোর রোলটা কি?

— ও হো। সেটাইতো বলা হয় নি। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে এবার আমাকে পুরুষ বিভাগের প্রতিনিধিত্বের ভার দেওয়া হয়েছে। এটা একটা বিশাল এ্যাচিভমেণ্ট। কি বল?

— তা তো নিশ্চয়। তা যেতে হবে কবে?

— আগামী শুক্রবার হাওড়া থেকে ডিলাক্সে রওনা হচ্ছি। নন্দন, তুই কিন্তু অবশ্যই স্টেশনে আসছিস আমায় সি-অফ করতে। কোন অজুহাত কিন্তু শুনব না।

— না না। অবশ্যই আসব। ট্রেনের টাইমটা যেন কটায়? যাক। সেটা পরে দেখে নিচ্ছি। অচ্ছা এখন চলি। অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে।

সেদিন ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পারিনি। হাওড়া স্টেশনে আগামী শুক্রবার কিসের সূচনা হতে চলেছে। অবশ্য পারা সম্ভবও ছিল না। কোথা থেকে কি যে ঘটে তার আগাম আভাস যদি পাওয়া যেত তাহলে কত সুবিধাই না হতো। অনেক হিসেবী হতে পারতাম। কিন্তু না। কখনই পারা যায় না। আবার বলি তাঁর কাছে কত অসহায় আমরা তা আজ বুঝি। কিন্তু সেদিন ছিল যৌবনের দুরন্ত উন্মাদনা। পেশীর তন্তুগুলো ছিল একেবারে টানটান। আমার মতো নিলয়ের ক্ষেত্রেও কথাটা প্রযোজ্য ছিল। এমনই হয়। যার জন্য চুলচেরা পরীক্ষার নিক্তিতে ছুঁড়ে ফেলে মানুষ ভেসে যায় আবেগের সাগরে। বহু মহাজন অনেক কথা বলেছেন। কেউ বলেছেন মোহ, আবার কেউ বা অন্ধ আকর্ষণ বলে আখ্যা দিয়েছেন। আমার মনে হয় জীবন জুয়ার এই দানটা ফেলার সময় আমরা চোখ বন্ধ করেই ফেলি। বাইরের চোখ নয়। মনের চোখ। সে চোখ খোলে অনেক দেরীতে। চোখমেলে কেউ দেখে জয় তার করতলগত। কেউ বা হারের ভার মাথায় নিয়ে মোটবাহী পশুর মত টেনে যেতে থাকে বাকি জীবনটাকে। ইচ্ছা অনিচ্ছা ভাল লাগা মন্দ লাগার ব্যাপারগুলো ক্রমাগতই আরো বেশী ফিকে হয়ে আসতে থাকে। এভাবেই চলতে চায় সে। কিন্তু "প্রিয়ার" প্রতি একেবারে নির্লিপ্ত হতেও পারে না। অন্তত দু-একজনতো এমনই ব্যতিক্রমী। যেমন ছিল নিলয়।

দিল্লী যানেবালী রাজধানী এক্সপ্রেস পাঁচ বাজে নয় নম্বর প্ল্যাটফর্ম সে ছুটেগী। রাজধানী উইল লিভ ফ্রম প্ল্যাটফর্ম নাম্বার নাইন এট সেভেন্টিন্ আওয়ারস্। বাংলা এ্যানাউন্সমেন্টটা হয়ে যাওয়ার পর ঢুকেছি। একটু জলদি পায়ে এগিয়ে চলছিলাম লাল-সাদা ট্রেনটার দিকে। ইতিমধ্যে অন্যান্য গাড়ী ছাড়ার ঘোষণা চলছে। গার্ডের কামরাটা পেরোতেই শুনতে পেলাম দিল্লীগামী রাজধানী নম্বর.........। প্ল্যাটফর্মের অনেকটা জুড়ে এন. সি. সি. ক্যাডেটদের জটলা। পোষাক-আশাকগুলো চোখে পড়ার মত ঝকঝকে। হওয়াই অবশ্য স্বাভাবিক। নিলয় বলেছিল এটা এন. সি. সি.-র সেন্ট্রাল র‍্যালী। এখানে যোগদান করতে হলে ড্রেসআপটা একেবারে একনম্বর হওয়াই উচিত। ভাবতে ভাবতেই চোখে পড়ে ডিলাক্সের একটা বগির সামনে দাঁড়িয়ে নিলয়। এগিয়ে গিয়ে ডাকতেই

ফিরে তাকাল সে। হেসে বলল, আরে আয় আয়। নে কফি খা। জিজ্ঞাসা করি, তোদের সঙ্গে মহিলারাও যাচ্ছে দেখি।

ওঃ। বলতে ভুলে গেছি বুঝি। হ্যাঁ ওরা যাচ্ছে। এটাতো মিক্সড র‍্যালী। শোন, এদিকে আয়। তোকে একটা সারপ্রাইজ দেবো। সেক্টর কম্যাণ্ডার একেবারে সামনের দিকে গেছে।

আমার হাত আঁকড়ে সামনের দিকে নিয়ে চলে নিলয়। পরের কামরা দুটো পার হতে চোখে পড়ে একদল মহিলা ক্যাডেট দাঁড়িয়ে।

— মিলি, এদিকে এস। এগিয়ে আসে এক তরুণী। কাঁধ অবধি ছাঁটা চুল। গায়ের রং পাকা জলপাই-এর মত। ছিপছিপে চেহারা।

— মিলি এই হলো নন্দন। তোমাকে তো ওর কথা অনেক বলেছি। অবশ্য তোমার কথা ও জানে না। একটা সারপ্রাইজ দেবো ভেবেছিলাম। আজ সুযোগটা জুটে গেল।

সামনে এসে দাঁড়ায় মিলি। নমস্কার বিনিময় হয়। বেশ খানিকটা অবাক হই আমি। এর কথা তো নিলয় কোনদিন বলেনি। কথাবার্তায় বুঝতে পারি দু'জনের পরিচয়ের বয়স একেবারে কম নয়।

জানিস নন্দন। বলতে থাকে নিলয়। মিলি এন. সি. সি.-র লেডিস উইংসের ক্যাপ্টেন। বিগ পারফরমেন্স হোল্ডার।

আরো দু'একটা এলোমেলো কথার পর আবার আমরা ফিরে আসি নিলয়দের কামরার দিকে। দলের অন্য কয়েকজনের সাথেও পরিচয় হলো। এভাবে আরো কিছুক্ষণ কাটার পর ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে আসে। সবুজ সংকেত পেয়ে বিরাট ইস্পাতের অজগর গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। তারপর আস্তে আস্তে নিলয়ের কমারাটা এগোতে থাকে সামনের দিকে। ভিতর থেকে হাত নাড়ে ও। আমিও হাত নেড়ে ট্রেনের সঙ্গে কিছুটা এগিয়ে যাই। স্পীড বাড়ে। মধ্যম গতিতে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে যায় ডিলাক্স। ঘড়িতে দেখি সময়টা। দু'নম্বর থেকে ব্যাণ্ডেল লোকাল ছাড়ার অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে। এগিয়ে যাই সেদিকে। চারিদিকে কোলাহল আরো বেড়ে গেছে। অফিস ফেরত অসংখ্য মানুষের জনস্রোত নীড়মুখি। এসব কিন্তু ছোঁয় না আমায়। নিলয়ের কথাটাই বারবার ফিরে আসতে থাকে মনে। আগামী দিনে দু'জনের আজকে দেখা সম্পর্ক আরো বেশী ব্যাপ্তির পরিসরে ছড়িয়ে যাবে কিনা কে জানে।

শনিবারের রাতটা তখন আমরা খুব রিলাক্সড মুডে থাকতাম। পরদিন ছুটি। সকালে ওঠার তাড়া নেই। আমাদের বাড়ীতে শনিবারের পারিবারিক আড্ডার আসর চলতো বেশ রাত অবধি। এরকম জমাট আসরের মধ্যেই খবর এল। দিল্লী থেকে ফোন এসেছে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। যে প্রতিবেশীর বাড়ীর ফোনটা ছিল সেটা আমার বাড়ী থেকে বেশ কিছুটা দূরে। ফোন তুলতেই নিলয়ের গলা। দিল্লীতে আগামীকাল ওদের র‍্যালী। রাতে রেডিওর খবরে অবশ্যই শোনা যাবে। আমি যেন অবশ্যই শুনি. জানায় নিলয়।

নিশ্চয়ই শুনবো। আশ্বাস দিই ওকে। আরো দু-একটা কথার পর ফোনেই বিদায় জানাই নিলয়কে। বাড়ী আসার পথে আমার মনেও আনন্দের ঢেউ। যাক্, একটা বিরাট স্বপ্ন সফল হতে চলেছে নিলয়ের। আরো কয়েকদিন পরের কথা। আমার অফিস চলছে পুরোদমে।

একটু আগেই একটা ফাইল শেষ করেছি। বেশকিছুদিন ধরেই আটকে ছিল। সিদ্ধান্তটা নেয়া যাচ্ছিল না আরকি। একটু হালকা মনে চায়ের অর্ডার দিতে যাচ্ছিলাম। ঠিক তখনই দরজাটা একটা পাল্লা খুলে গেল। মুখ বাড়াল নিলয়।

— মে আই কাম ইন স্যার?

চমকে তাকাই। ওর মুখ দেখে একটু অবাকও হই। একটু আড়ষ্টতা, একটু কুণ্ঠার আভাস যেন। বলে উঠি, ইয়ার্কি হচ্ছে। এ ঘরে ঢোকার আগে পারমিশান নিতে শুরু করলি কবে থেকে।

একটু হেসে ওঠে নিলয়, হাজার হোক এটাতো অফিস। একটা নিয়ম মানার ব্যাপার থাকে তো। কি বল!

— বাজে বকিসনা। আয়, বোস। আমি হাত বাড়িয়ে সামনের চেয়ারটা দেখাই। নিলয় শোনেই না।

— বসার ব্যাপার নয়। শোন, একটা ব্যাপার হয়েছে। তুই একবার নীচে আয়। নিলয় অস্থিরতা দেখায়।

আমি বেশ খানিকটা অবাক। তারপর মনে পড়ে। তা তুই এসময় এখানে কেন? অফিস কেটেছিস নাকি?

— ক্যাজুয়াল লীভ। অফিস মুখোই হইনি আজ। এসব ছাড় এখন। ও বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। চল আমার সঙ্গে। নিলয় বলতে থাকে।

— ও। ও কে? কে দাঁড়িয়ে আছে? ব্যাপারটা কি?

নিলয় একটু ঢোঁক গেলে। ও, মানে মিলি। তোর সঙ্গে আমাদের দু'জনের একটা দরকারি আলোচনা আছে। একটা ভাইটাল সিদ্ধান্ত আজই নিতে হবে। প্লীজ, নন্দন আজ একটু অফিস ম্যানেজ করে আমাদের সাথে চল।

মিলি এসেছে শুনে বিস্মিত হই। তাহলে তো নিশ্চয় কোনো ব্যাপার হয়েছে। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আসি নিলয়ের সাথে। তা ওকে নিয়ে আসবি তো। নীচে দাঁড় করিয়ে রেখেছিস কেন? তোর আর বুদ্ধি-বিবেচনা হবে না। এরকম দু-একটা কথা বলতে বলতেই দরজা পেরিয়ে দু'জনে একেবারে মিলির সামনে। নীল শাড়ী-ব্লাউজে রাজেন্দ্রাণীর মত দাঁড়িয়ে মিলি। গায়ের রং-এর সাথে সাজপোশাকটা এত সুন্দরভাবে মানিয়ে গেছে, যে একটা অন্যরকম মাত্রা পেয়ে যায়। কাছে যেতেই হেসে আমার দিকে তাকায় সে। পথ চলতি মানুষের বেশীর ভাগই ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে ওর দিকে। তাদের অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। সুন্দরের পূজারী মানুষের মন তো সবসময়েই। নন্দনদা, চলুন আজ আমরা একটা জায়গায় বসি। আপত্তি শুনব না কিন্তু। আজ আমরা দু'জনেই অফিস কেটেছি। আপনিও অফিসে বলে আসুন না। আবদার করে মিলি। একটু ইতস্তত করে রাজী হয়ে যাই। বলি, বলতে হবে না। আজ এমনিতে কাজের চাপ ছিল না। চল তাহলে। শুনে খুশী হয় ওরা। যেতে যেতে ভাবি ওয়ার্কিং লেডি বলেই কি এত সপ্রতিভ মিলি। না হলে আজ নিয়ে মাত্র দু'বার দেখা। সামান্যক্ষণের আলাপেই এতটা আপনভাব হয় না সাধারণত।

এসপ্ল্যানেডের অন্নপূর্ণা রেষ্টুরেন্ট। এখানকার পরিবেশটা বেশ ছিমছাম। নিলয় জানায় এখানেও মিলিকে নিয়ে প্রায়ই আসে। না বললেও বুঝতে পারি বইকি। পরিচিত জায়গা না হলে এত অনায়াসে মহিলা সঙ্গে নিয়ে খাবার দোকানে ঢোকা যায় না। জিজ্ঞাসা করি, এটা কার আবিষ্কার। নিলয়ের না তোমার। বলতে পারেন দু'জনেরই। হেসে ওঠে মিলি। এখানে সেল্ফ সার্ভিসের ব্যবস্থা তাই নিলয় কাউন্টার থেকে খাবারের ব্যবস্থা করে। একটু অস্বস্তি বোধ করি। এরা দু'জনেই বলছে যে আজ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নিশ্চয়ই আগামী জীবনের ব্যাপার। কিন্তু যতদূর দেখছি এদের আলাপ পরিচয় তো একেবারেই অল্পদিনের বলা যায়। সেক্ষেত্রে এতবড় একটা ডিসিশান এত সহজে নেয়াটা ....। একটু গলা খাঁকরে পরিষ্কার করে নেয় নিলয়। শোন নন্দন,

যে আলোচনার জন্য এখানে আসা। আমার দিকে ঝুঁকে আসে দু'জনেই। আমরা ঠিক করে ফেলেছি। মানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়েটা করে ফেলতে চাই। তুই কি বলিস। আমি হেসে উঠি। দু'জনের অবস্থা দেখে। আরে, এটাতো ভাল কথা। আলাপ প্রলাপ অপলাপ, একেবারে সবই হয়ে গেল বল। একটু অপ্রস্তুত হাসে দু'জনেই। বলি, বাড়ীতে জানিয়েছিস!

— আরে ওটাই তো আসল বিষয়। তুই তো জানিস নন্দন! বাবা ঠিক। এই টাইপের বিয়ে মেনে নিতে রাজী হবেন না। দেখ, বাবাকে বলার ভারটা তুইই নে। কারণ এই একটা ব্যাপার নিয়েই আমার টেনশান। বলতে থাকে নিলয়। ইতিমধ্যে তিনজনেই খেতে শুরু করি। লক্ষ্য করি মিলির মুখের মধ্যে একটু যেন চিন্তার ছাপ। আমার খারাপ লাগে। নিলয়ের জন্য আমার কাছে একটা আলাদা জায়গা আছে। মনে হয় এই অবস্থায় ওর এই কাজের ভারটা আমার নেওয়া উচিত। তবুও একটা ছোট্ট দ্বিধা থেকেই যায়। নিলয়কে আমি ভালভাবে জানি। ওর পরিবারের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা আমার বহুদিনের। ওরা আমাদের বাড়ীর মতোই নিম্নমধ্যবিত্ত। আর আমার দ্বিধার কারণটা এখানেই। অল্প দেখা হলেও মিলিকে আমি স্টাডি করেছি। আজ নিয়ে দু'দিনের দেখা হলেও এটা বুঝতে পারছি যে ও একটু আধুনিকা গোছের। মানে পুরোপুরি 'মডার্ন' হয়তো নয়, কিন্তু চিন্তাভাবনার পরিধি এটাকেই ঘিরে সম্ভবত। এই মেয়ে কি একেবারে সবকিছু ভুলে মিশে যেতে পারবে ব্যানার্জী পরিবারে। প্রশ্নটা বারবার ঝাপটা মারতে থাকে মনে। কলকাতায় বর্ষা এসে গেছে। আজকের আবহাওয়াটাও বর্ষারই। ইলশেগুঁড়ি। ঝরছে সকাল থেকেই। তবে একটা অদ্ভুত ব্যাপারও আছে। এই ধরণের বৃষ্টিতে সাধারণত হাওয়া থাকে না। আজ কিন্তু অন্যরকম। মাঝে মাঝেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বৃষ্টি। পেঁজা তুলো গুঁড়ো আকাশেই থেকে যাচ্ছে। তার জায়গায় আসছে দমকা হাওয়া। জোর করে সোজা হয়ে বসি। এটা হয়তো কিছুই নয়। সবটাই কাকতালীয়। বৃষ্টি মানে তো শুভ ইংগিতও হতে পারে।

— কিরে, কি ভাবছিস জানালার দিকে তাকিয়ে। কাঁধের ওপর নিলয়ের হাতের চাপড় খেয়ে চমকে উঠি। না, কিছু ভাবছি না। বল কি বলছিস।

— বলছি তুই কালই বাবাকে এই কথাটা বল। ব্যগ্রস্বরে বলে ওঠে নিলয়।

— কালই, ইতস্তত করি আমি। একেবারে কোনরকম প্রস্তুতি ছাড়াই

সরাসরি মেশোমশাইকে এতবড় কথা বলাটা ঠিক হবে কিনা ঠিক বুঝতে পারি না। হঠাৎ একটা সহজ সমাধানের কথা মনে আসে। হ্যাঁ, এটাইতো একেবারে নিরাপদ উপায়।

— আচ্ছা নিলয়! মাসিমা এ ঘটনাটা জানেন? তুই কি কিছু বলেছিস?

— না না! বাড়ীর কেউই কিছু জানে না।

— দি আইডিয়া। তুই এক কাজ কর। আজ রাত্রেই ফিরে গিয়ে মাসিমাকে সবকথা খুলে বল। আমার মনে হয় এটাই সবচেয়ে ভাল হবে।

— মাকে একেবারে সোজাসুজি বলবো। একটু ইতস্ততভাব নিলয়ের মুখে। মিলি কিন্তু একটু ছাড়াভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে। আমার একটু অদ্ভুত লাগে। এতবড় একটা ব্যাপার। দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ করার মুখে, বলা যায় দু'জনেই একটা সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। এসময় যে কোন নারীর মুখেই খেলা করে একটা লজ্জামেশানো অরুণিমা। আনন্দের সাথে কিছুটা ভয় আর দ্বিধাসংকোচ মিলিয়ে যে একটা অপরূপ ভাবের খেলা থাকে তা যেন ওর মধ্যে অনুপস্থিত। এর কারণটা কি? যাকগে। এ হয়তো আমারই দেখার ভুল। চোখ আর মন হয়তো একই সাথে অসমতল প্রতিবিম্ব প্রদর্শন করছে। নিলয় জানায় ও এখন ওর মামার দোকানে যাবে। মিশন রোতে। রোজ অফিসের পর ঘন্টা দুয়েক সে এখানে দেখাশুনা করে। মামার ছেলেমেয়ে নেই। মোটর পার্টসের দোকানটা বেশ ভালই চলে। মিলিকে বাসে তুলে দিয়ে নিজেও মিশন রোর দিকে হাঁটতে থাকে নিলয়। পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেবার পালা আগেই চুকে গিয়েছিল। ধূসর গোধূলি চলে গেছে। মহানগরীতে নেমে আসছে বিশাল ডানা মেলে একটা বিরাটাকারের বাদুরের মতো অন্ধকার। খেয়াল করিনি কখন থেমে গেছে দানা দানা বৃষ্টি। দমকা বাতাসও নিয়েছে বিদায়। এগোতে থাকি ট্যাক্সিস্ট্যাণ্ডের দিকে। হঠাৎ যেন শরীরটা কিরকম ভারী ভারী লাগছে। আবার ভীড় বাসের মধ্যে উঠতে ইচ্ছা করে না। বাড়ী গিয়ে কতক্ষণে গা ঢালব বিছানায় সেটাই চিন্তা করতে থাকি।

(২)

কথাটা শুনে যেন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। একি শুনছি! সবে গতকাল ফুলশয্যা হয়েছে। প্রত্যেকের জীবনেই তো এ রাতের তুলনা নেই। প্রভাতবেলায় সুখাবেশগুলো বিদায় নেয়, কিন্তু অদৃশ্য ফুলের পাপড়ির রেণুর মত তার স্পর্শ লেগে থাকে দু'জনের শরীরে। তারই রেশ ধরে পরের দিনটাও যেন ভরে থাকে এক রিমঝিমে অনুভূতিতে। এও একরকমের বৃষ্টি বইকি। এর অঝোর ধারায় স্নান করে এক নতুন জগতে প্রবেশ। এ একান্ত নিজের বা নিজেদের জগৎ। সন্দেহটা একটু হলেও হয়েছিল। কিন্তু আমল দিইনি। আগের দিন শুতে শুতে অনেক রাত হয়েছিল। তাই ভোরে ওঠা অভ্যেস হলেও আজ উঠতে একটু বেলা হয়েছিল। ভোরের দিকে ঘুমের আবেশটা আরো প্রবলভাবে জড়িয়ে ধরছিল। ক্লান্তিবশতঃ একটু পরে উঠব এই মনে করে পাশ ফিরে শুয়েছিলাম। তারপর কখন যে ঘড়িতে আটটার ঘন্টা বেজে গেছে, তা টেরও পাইনি। তারপর নিলয়ের কথাটা মনে পড়তেই তাড়াতাড়ি উঠে বসেছিলাম। আজ সকালে নিলয়ের বাড়ীতে আমাদের চায়ের নেমন্তন্ন। আরো কয়েকজন বন্ধুও আসবে। চা জলখাবারের পর্ব মোটামুটি শেষ হলো। মিলি কিন্তু শুধু জলখাবারের ট্রেটা নামিয়ে দিয়েই বাড়ীর ভিতরে চলে গিয়েছিল। একটু চোখে লাগলেও বলিনি কিছু। হয়তো বাড়ীর কাজকর্মে আছে এটাই ভেবেছিলাম। নিলয়ের ভঙ্গীটা কিন্তু একেবারেই নিষ্প্রাণ। চোখটা একটু লালচে। এদিনে একটা ছেলের মধ্যে যেমন তরতাজা ভাব থাকে, ওর মধ্যে একেবারে উল্টো যেন। দু-পাঁচ মিনিট এলোমেলো কথা বলার পরেই ও বলল, চল নন্দন! একটু ঘুরে আসি। আর তিন জন বন্ধু ততক্ষণ চলে গেছে। ছুটির দিনতো নয়। সবারই অফিস আছে। বাড়ী থেকে একটু দূরে এসেই আমি আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারলাম না। বললাম, কি ব্যাপার বলতো নিলয়? তোদের দু'জনকেই আজ একেবারে অন্যরকম লাগছে। আজকের দিন নবদম্পতির এরকম হয় নাকি?

থমকে দাঁড়ায় নিলয়। মুখের ভাব একেবারে থমথমে। ছলছল চোখে আমার হাত দুটো চেপে ধরল। নন্দন, এই মেয়েকে ভাল লাগে। দূর থেকে ভালবাসা যায়। কিন্তু এদের নিয়ে সংসার করা যায় না।

—দেখ, তোর মুখ দেখে কিছু অনুমান করেছিলাম। বলিনি যদিও। মানে

...... বাড়ীর মধ্যে তো আর এ নিয়ে আলোচনা করা যায় না। ব্যাপারটা কি?

—বলার কিছু নেই। শুধু এটুকু জেনে রাখ আই হ্যাভ ডান দি গ্রেটেষ্ট-ব্লাণ্ডার ইন মাই লাইফ।

আমার বিস্ময় আর বাঁধ মানে না। কি হলো? খুব কম ক্ষেত্রে হলেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধ এদিনেও হয়। কিন্তু পরের দিন মিটেও যায়। কিন্তু এরকম চরম কথা তো কোনো ছেলের মুখে শোনা যায় না।

তার রূপের শেষ নেই। অন্ত নেই তার বহিঃপ্রকাশের। যদি সে কল্যাণীরূপে আসে তবে ভরিয়ে দেয় চারিদিক। আবার যদি আসে ধূমাবতীরূপে তাহলে সমস্ত কিছু ধ্বংসের কারণ হয়ে ওঠে। একথা বহু প্রজ্ঞাবান বহুবার আলোচনা করে গেছেন। মিলির রূপের সঠিক বর্ণনা দেওয়া বোধ হয় অসাধ্য। আর তার চেয়েও অসাধ্য ছিল বিচার করা খেয়ালের মাপকাঠি। এরপর স্রোতের মত সময় চলে গেছে। আমি তখন আমার হাইড রোডের অফিস ছেড়ে এলগিন রোডের অফিসে বসছি। আর পাঁচটা সফল হতে চাওয়া মানুষের মত আমার ভিতরেও উচ্চাকাঙ্খার চাপ বেড়ে উঠেছিল উত্তরোত্তর। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছিল কাজের চাপও। তখনও কলকাতাটা এখনকার মত ময়দানব হয়ে ওঠেনি। ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে জানালার সার্শি দিয়ে চোখ গেলে রাস্তার ওপারে শিমুল কিংবা কাঠ বাদামের গাছ দেখা যেত। ক্রমশই এক বসন্তের দিনে অফিস থেকে বেরিয়ে বাস স্টপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা ট্যাক্সি নেবো ভাবছি। হঠাৎ কাঁধে একটা স্পর্শ। ফিরে তাকিয়ে দেখি মিলি। জাফরান রং-এর একটা শাড়ী আর কপালের সামনে কয়েকটা এলোমেলো চুল। দেখেই মনে পড়ে গেল আমাদের গ্রামের চামেলীদির কথা। বালবিধবা সেই শালুক রঙা মেয়েটি একেবারেই এরকম ছিল না। তবু কেন যে তার কথা মনে পড়েছিল কে জানে? আমাকে ও টেনে নিয়ে গেল সেই পুরান রেষ্টুরেন্টে। কফিতে ঠোঁট রেখে বলল, আপনাদের স্বরূপনগর জায়গাটা কিন্তু বড় অদ্ভুত। সন্ধ্যার পর থেকে এত নির্জনতা। রাত যত বাড়ে ঝিঁঝির ডাকও ততই বাড়ে। এত নির্জন জায়গায় কি করে থাকেন আপনারা।

আমি বিব্রত বোধ করি। দেখ, কলকাতার তুলনায় এত দূরের মফঃস্বল। এখানে নির্জন তো হবেই।

না নন্দনদা। শুধু নির্জনতা নয়। আমাদের রসা রোডের বাড়ীও তো খুব

একটা জমজমাট এলাকাও নয়। কিন্তু এখানে যেন একটা ভয়ের ব্যাপার।

কিছুটা আত্মস্থ ভাব মিলির কণ্ঠে।

ভয়! কিসের ভয়? আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠি। কোলকাতার এই পরিবেশের পাশাপাশি এখানকার সাথে এ্যাডজাসমেন্টের সমস্যা তো হতেই পারে। কিন্তু তার সঙ্গে ভয় পাওয়ার কি সম্পর্ক?

একটু ম্লান হাসে মিলি। ঠিক হাসে না। একটা হাসির আভাস ওষ্ঠে খেলা করে মাত্র। না নন্দনদা। ভূতের ভয় না।

তবে? কি ব্যাপার বল না? একটু যেন অনুনয়ের সুরেই বলি।

নাঃ। বলে কি হবে? একটা চাপা নিঃশ্বাসের সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় মিলি। চলুন ওঠা যাক। বলতে বলতেই এগোতে থাকে দরজার দিকে। কিছুটা হতচকিত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু মনে পড়ে গেল ওভালটিন কেনার কথাটা। এই নিয়ে দু'দিন ভুলে গেছি। আজ আর ভুললে চলবে না। ততক্ষণে মিলি এগিয়ে গিয়ে উঠে পড়েছে একটা বাসে। কিন্তু হাওড়াগামী নয়। এ বাসটা তো সাউথের দিকে যায়। কি ব্যাপার? ও। তাহলে বোধহয় আজ বাপের বাড়ীতেই থাকবে।

দুম্ দুম্ শব্দে কে যেন দরজা ধাক্কা দিচ্ছিল। ক্রমশই বাড়ছিল ধাক্কার মাত্রা। তাই প্রথমদিকে শুনতে পাইনি। ধড়মড় করে উঠে বসি। উঠে পড়েছে মাও। নন্দন, এই নন্দন। উঠে দেখ। কে যেন ডাকছে। চোখ কচলে দেখি রাত তিনটে। এত রাতে কে ? দরজা খুলতে এগিয়ে যাই। ততক্ষণে উঠে পড়েছে বাড়ীর আর সবাইও। দরজা খুলেই হতভম্ভ। মিলি আর নিলয়। নন্দন শিগগিরি আয়। বাড়ীতে চুরি হয়ে গেছে।

সে কিরে! কখন হলো? বলতে বলতে ওদের নিয়ে বাইরের ঘরে ঢুকি।

মিলির চোখের কোণে ভীতিপূর্ণ বিস্ময়ের ভাব। ওরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। সারাদিন অফিস কাছারি করে ক্লান্তি তো ছিলই। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় জলতেষ্টায়। জল খেতে উঠে নিলয় দেখে পাশের ঘরের দরজাটা পুরো খোলা। দরজা দিয়ে বাগান দেখা যাচ্ছে। মিলিকে ডেকে তোলে সে। দু'জনের চেঁচামেচিতে উঠে পড়েন নিলয়ের বাবা-মাও। দেখা যায়। আলমারীর পাল্লাটা হাঁ করে খোলা। উধাও তিনখানা ট্রাঙ্কও। পরে দেখা যায় দুটো জানালার পাল্লাও ভাঙা। এসব বলতে বলতে হাঁপাতে থাকে নিলয়। মিলি কিন্তু একেবারে চুপ। দু'হাতে

মুখ ঢেকে বসে আছে ঘরের এক কোণে। আমার মা বলেন, যাক যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন আগে তো পুলিশে খবর দিতে হবে। তোরা সেটার ব্যবস্থা কর। এইসব আলাপ আলোচনার মধ্যেই আমি নিলয় ও মিলিকে নিয়ে বেরিয়ে আসি। বাইরে নিকষ কালো অন্ধকার। টর্চের আলোয় সামনের দিকে এগোতে থাকি। আমার পিছনে ওরা দু'জন।

আমি আগেই বলেছিলাম এখানে থাকা যাবে না। আজ চুরি হয়েছে। কাল ডাকাতি হবে। এর থেকে কোলকাতায় থাকা অনেক ভাল। মিলির স্বরে হতাশার চেয়ে উষ্মার ভাবই বেশী। দেখ, এটা একটা কথা নয়। আজ পর্যন্ত এখানে এরকম হয়নি। এখানে বাস করা যায় না এটা তোমার ভুল ধারণা। কুণ্ঠার গলায় বলে ওঠে নিলয়। আমিও ওর কথায় সায় দিই। দেখ মিলি, ক্ষতি তো হলো নিশ্চয়। কিন্তু অবাক কাণ্ড এটাই যে এতদিন ধরে আছি এখানে। এই ঘটনা এর আগে আমাদের পাড়ায় হয়নি।

সে আপনি যাই বলুন। মিলি যেন আরো দৃঢ় হতে থাকে। আমার বাপের বাড়ী হলে এত সহজে এটা হতো না। যাক শোনো তুমি এখন বাড়ী ঢুকে যাও। আমি নিলয়কে নিয়ে ফাঁড়ির দিকে যাই। রিক্সাওয়ালাকেও বোধহয় ঘুম থেকে তুলতে হবে। তার আগে একটা ফোন করার ব্যবস্থা করতে হবে। নন্দনদা, আমার এক কাকা লালবাজারে আছেন। কাকুকে একটা খবর দিতে পারলে ভাল হয়। জানায় মিলি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে একটা কিনারা হতে পারে। নিলয়ও সমর্থন করে। কিন্তু ফোন কোথা থেকে করা যায় বলতো নন্দন? তখন আমাদের গোটা চত্বরে অদূরে আমার চেনাশোনা এক প্রতিবেশী ভদ্রলোকের বাড়িতে ফোন ছিল। কিন্তু এত রাতে তাকে কি করে ডাকবো। এসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে যায়। স্টেশনের বুকিং কাউন্টার থেকে তো ফোন করা যেতে পারে। বলি, চল, এ. এস. এম. আমার পরিচিত। নিশ্চয়ই ফোন করতে দেবেন। নিলয়কে নিয়ে স্টেশনে পৌছাই। লালবাজারে মিলির কাকাও সেদিন ভাগ্যক্রমে নাইট ডিউটিতে ছিলেন। নিলয়ের মুখে খবরটা শুনে তিনি বলেন যে আমাদের আজ রাতে আর ফাঁড়িব দিকে যাওয়ার দরকার নেই। তিনিই লালবাজার থেকে ফোনে পুলিশ ফাঁড়িতে বলে দেবেন। আমরা যেন কালকে গিয়ে রিপোর্টটা লিখিয়ে আসি। ফিরতে ফিরতেই বেজে গেল প্রায় ভোর চারটে। লালবাজারের নির্দেশে পরদিন সকালেই পুলিশ এল। অনুসন্ধানে তিনখানা ট্রাঙ্ক আর একটা

বড় সুটকেশ ভাঙা অবস্থায় ঝিলের ধারে পাওয়া গেল। যদিও ভিতরের জিনিষপত্র সব লোপাট।

মাসখানেক পরের কথা। একটা সাহিত্য সম্মেলনে গিয়েছি। এই প্রতিষ্ঠানটি আমাদের এখানকার খুব নামকরা সংগঠন। নিলয়ও এখানকার সভ্য। এক প্রথিতযশা সাহিত্যিককে সম্বর্ধনা দেওয়ার অনুষ্ঠান ছিল। এর মধ্যে ওর বা মিলির সঙ্গে আর দেখা হয়নি। ভেবেছিলাম আজ নিশ্চয়ই ওকে দেখতে পাব। নিজে লেখক না হলেও নিলয় কিন্তু যথেষ্ট সাহিত্যরসিক। সাহিত্যপ্রেমীও বলা যায়। কিন্তু অনুষ্ঠানে ওর দেখা পেলাম না। এর মধ্যে আমি একদিন আমার মাকে মিলির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। মায়ের মুখ থেকে কিন্তু খুব একটা ইতিবাচক সাড়া পাইনি। খানিকটা জোর করেই জানতে চাইছিলাম। আর ততই যেন মা আমাকে এবিষয়ে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। মায়ের এই ব্যাপারটা আমার অন্যান্য বন্ধুবান্ধবকে অবাক করতো। একদিকে এত ব্যক্তিত্বময়ী, কর্তব্যে কঠোর। আবার কিছু কিছু সময়ে ছেলেদের সঙ্গে একেবারে বন্ধুর মত আচরণ এই বৈপরীত্যের তল খুঁজে পেতনা অনেকেই। আমি কিন্তু বুঝতাম। মা বলতেন, মায়ের চোখে ছেলে বড় হয় না কোনদিনই। কিন্তু একটা বয়সের পর ছেলেমেয়ের সাথে বন্ধুর মত মেশা উচিত। নিজের জায়গা বজায় রেখেও এটা করা যায়। আর এটা বজায় থাকলেই সংসারের বহু সমস্যাই এক নিমেষে সমাধান হয়ে যায়। মা বারবার বলছিলেন, নিলয়কে বেশী করে মানিয়ে নিতে হবে। জানতে চাইছিলাম, কেন, মিলিকে দেখে কি তোমার মনে হয় ওর মধ্যে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা কম। ওকে তোমার কেমন মনে হয়। মা সরাসরি উত্তর দেননি। শুধু বলেছিলেন, ওসব বলতে নেই। মায়ের কাছে সব সন্তানই ভাল। কেউ খারাপ নয়।

সন্ধ্যে নেমে গেছে। যাচ্ছিলাম নিলয়ের বাড়ীর দিকেই। ভাবছিলাম হয়তো ওকে পাব না। ফিরতে অনেক রাত হয় ওর। অফিসের পর ওর মামার দোকানেও বসতে হয়। এই ভাবতে ভাবতেই পৌঁছে গেছি সারদাকুঠিরে। গেটের সামনে যেতেই দেখলাম বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে মেশোমশাই। বললেন কে ? নন্দন নাকি ? এস এস, ভিতরে এস। কাছে বসে দু-একটা কথার মাঝে একটু অনুযোগও শুনতে হলো। বন্ধুর বিয়েব পর তোমার আসা-যাওয়া কমে গেছে। এটা কেন হবে, এই আর কি। মাসিমা মেশোমশাই দু'জনেই আমাকে

খুব স্নেহ করেন। কাজেই বেশীদিন এ বাড়ীতে না এলে এরকম সস্নেহ অভিযোগ আমাকে শুনতে হয়। আর দু-চারদিন পর থেকে তো বাড়ী একেবারে ফাঁকা হয়ে যাবে। আমাদের দিনগুলো কিভাবে কাটবে কে জানে?

মেশোমশাইয়ের কথা শুনে আমার ভিতরটা কেঁপে ওঠে। বাড়ী ফাঁকা হয়ে যাবে বলতে তিনি কি বোঝাতে চাইছেন। বলি বলি করেও কথাটা সরাসরি জিজ্ঞাসা করতে পারি না। এর মধ্যেই বেরিয়ে আসেন মাসিমা একটা টুল টেনে নিয়ে পাশে বসেন। নিলয় আর বৌমা আর এখানে থাকবে না। বুঝলে নন্দন। কণ্ঠস্বর কেমন যেন হাহাকারের মত শোনায়। ঠিক এই ভয়টাই পাচ্ছিলাম আমি। চুরির রাতেই ওর যেরকম একগুঁয়ে মনোভাব দেখলাম তাতে এটাই কিছুটা হলেও অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এই নেতিবাচকতার বিস্ফোরণ হবে এটা ভাবিনি। কারণ নেই তবুও নিজেকে যেন কিরকম একটা অপরাধী লাগে। অন্নপূর্ণা রেস্তোরাঁয় নিলয়কে পরামর্শটা আমিই দিয়েছিলাম। মেশোমশাইকে বিয়ের কথা বলতে বলেছিল নিলয়। তখন আমি ওকে বলেছিলাম যে এটা তুইই বল। তবে মেশোমশাইকে নয়। মাসিমাকে। তাই করেছিল নিলয়। ওর বিয়ের কথা মাসিমাই মেশোমশাইকে বলেছিলেন। রাজীও করিয়েছিলেন তাঁকে। আপত্তি তো করেনইনি মেশোমশাই, বরং খুশী হয়েছিলেন। বড় ছেলের বিয়ে। তিনিই জানিয়েছিলেন যে সব খরচ-খরচা তিনিই করবেন। জীবনবীমার অফিসার ছিলেন। বড়লোক না হলেও খুব খারাপ অবস্থা নয় তাঁর। বিয়েতে প্রচুর খরচ করেছেন। পুত্রের ভবিষ্যত সংসারের ছবির কল্পনায় সেদিন যেন খুশী উপচে পড়ছিল তাঁর। আর আজ অবস্থাটা একেবারে বিপরীত। ঠিক যেন প্রতিমা নিরঞ্জনের পরের দিন শূন্য মণ্ডপের মত অবস্থা। আরো কিছুক্ষণ পরে উঠে পড়ি আমি। বেড়িয়ে এসে যেন কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। নিলয় আর মিলি অফিস থেকে বাড়ী ঢোকার পথে আমাকে দেখেই দু'জন দু'ঘরে ঢুকে গেছে। আর আসেইনি আমার সামনে। অবস্থাটা বুঝতে পারি। বন্ধুর সামনে আবার কথাবার্তা হবে। কি বা আর বলবে? ব্যাপারটা যেন এই প্রবাদটার মত। স্বাদের জন্য না পারি ফেলতে আবার না পারি কাঁটার জন্য গিলতে। আর ঠিক এখানটাতেই অবাক লাগে আমার। নিলয় কিন্তু এরকম নরম প্রকৃতির ছেলে নয়। কিন্তু এখন যেন একেবারে মোহগ্রস্থ অবস্থা। বুঝলাম যে এ বিচ্ছেদ আর ঠেকান যাবে না।

মহাপ্রলয়ের পর ক্ষতিগ্রস্থ ইমারতের যা অবস্থা হয় নিলয়ের চেহারাটা ঠিক এখন এরকম লাগছে। আবার বলা যায় আচমকা ব্যাঙ্ক ফেল হলে সর্বস্ব হারানো গ্রাহকদের মত। কিছুই যেন বলার মত অবস্থায় নেই। জিজ্ঞাসা করি, এতকাণ্ড করে বাড়ী ছেড়ে চলে এলি। কোলকাতায় আলাদা বাসা করলি। এর পরে তো আর কোনো প্রবলেম হওয়া উচিত নয়।

অপ্রকৃতিস্থের মত বলে চলে নিলয়, কিছু বলার নেই রে নন্দন। কিছু করার নেই।

আমি অস্থির হয়ে পড়ি, তা ব্যাপার কি সেটা খুলে বলবি তো। এখন তো তোদের দু'জনের একান্ত লাইফ। কিন্তু তোর চেহারা দেখে তো ভয় লেগে যাচ্ছে আমার।

আমি খুব ক্লান্ত নন্দন। পা-দুটো যেন আর চলতে চায় না, স্বগতোক্তির মত বলে নিলয়। বুঝলি। আজ আবার বিকেলে হলদিয়া রওনা হতে হবে। বলতে বলতেই একেবারে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে ও। এই চাকরি, উঃ! লাইফটা হেল হয়ে গেল।

অফিসের কাজে যাচ্ছে কিনা, জিজ্ঞাসা করি সেটাই। খুব ভয় লাগে। এই অবস্থায় এতদূর হলদিয়ায় যাবে কি করে ও। সম্মতি জানায় নিলয়। একটা ইনস্‌পেকশানের কাজ পড়ে গেছে। তিনদিনের মধ্যে রিপোর্টটা ডেপুটি ম্যানেজারকে দিতে হবে।

মনের মধ্যে তোলপাড় হতে থাকে। কিন্তু কিবা করার আছে আমার?

মাস ছয়েক হলো ওদের বাড়ীতে আর যাওয়া হয়নি। ওদের বাড়ী মানে নিলয়ের পুরোনো বাড়ী। মায়ের শরীরটা খুব একটা ভাল যাচ্ছিল না। একে মফঃস্বল তার উপরে আবার ওপার বাংলা থেকে এসে অনেক ঝড়ঝঞ্ঝার মুখোমুখি হয়ে ধীরে ধীরে বানিয়ে তুলেছি আমাদের সংসার। অনেক স্বাদের এই পল্লীকে। প্রথম শ্রেণীর ডাক্তাররা তো এদিক প্রায় মাড়ায়ই না। তাই সামান্য একটা ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি বুঝতেই লেগে গেল এতগুলো দিন। কয়েকটা মাস। কিন্তু তার মধ্যেই বদলে গেল কোলকাতার রাজপথ থেকে স্বরূপনগরের গলিগুলি। নকশাল মুভমেন্টের আঁচ আর বারুদের গন্ধ আমাদের সবাইকেই যেন ক্রমশঃ ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী করে ফেলেছিল। ফলে রোজকার মত সেদিনও সাড়ে পাঁচটায় হাওড়া স্টেশনে ঢুকছি। এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের মুখে

একটা অন্যরকম জটলা দেখে পাশ কাটিয়ে যাব ভেবেও পারলাম না। একটা একমুখ দাড়ি খুব চেনামুখ দেখে। টিকিট না কেটে ধরা পড়ে চেকারকে অনুনয় করছে। ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম ওর পাশে।

কি নিলয়? কি ব্যাপার? জিজ্ঞাসা করি।

কি আবার হবে! ডব্লুটি। টিকিট চাইতেই অন্য গাইছে। বিদ্রুপ ঝলসে ওঠে চেকারের চোখে।

করুণ চোখে আমার দিকে তাকায় সে। বুঝলি মান্থলিটা আনতে ভুলে গেছি। উনি বিশ্বাস করছেন না।

আমি আর কথা বাড়তে দিই না। যাক ছাড় ওসব কথা। কি, ফাইন দিতে হবে নাকি। জিজ্ঞাসা করি চেকারকে। একটু নরম হয়ে ওঠে চেকার। মিনিমামটাই দিন। কুড়ি টাকা।

কোন কথা না বলে টাকাটা দিয়ে দিই। রসিদটা হাতে নিয়েই সোজা নিলয়ের হাতটা ধরে হাঁটতে থাকি। মাথা নীচু করে আমার সঙ্গে আসতে থাকে ও। চার নম্বর থেকে পেয়ে যাই ব্যাণ্ডেলটাও। বেলুড় পেরিয়ে যেতেই জিজ্ঞাসা করি। দিন দিন তোর একি অবস্থা হচ্ছে নিলয়। এত অন্যমনস্ক অবস্থা চললে তো কোনদিন বড় একটা অ্যাকসিডেন্ট করে ফেলবি।

আর কি হবে। অ্যাকসিডেন্ট হলে হবে। জীবনটাই শেষ হয়ে গেল রে নন্দন। নীচুস্বরে বললেও স্বরটা যেন গোটা কামরা ছাড়িয়ে চারিদিকে হাহাকারের অদ্ভুত একটা কুয়াশার মত পাক খেতে থাকে ক্রমাগত। আমার সমস্ত প্রশ্ন যেন হারিয়ে যায় এক নিমেষে। স্টেশনে নেমেও কোন কথা বলিনা। চেনা রিকশাওয়ালাটাও আজ খুব জোরে চালাচ্ছে। হটাৎই একেবারে সোজা হয়ে বসে নিলয়। আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে। কাল আমায় আবার হলদিয়া যেতে হবে। নন্দন প্লীজ। চল আমার সঙ্গে। বলবো, সব বলবো। একটু হালকা হতে হবেই। তোর কাছে ছাড়া আর কোথাও তো বলার নেই। তুই যাবি তো, বল, বল না। বারবার কথাটা যেন আছড়ে পড়ে আমার উপর।

ঠিক আছে, একটা সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলি আমি। চল, যাব তোর সঙ্গে। নাম, বাড়ী এসে গেছে।

রিকশা থেকে নেমে আর এদিকে ফেরে না সে। সোজা গেট ঠেলে বাড়ীর দিকে চলে যায় নিলয়। আর কিছু বলতে হয় না। প্যাডেলের চাপে ত্রিচক্র যান সোজা এগোতে থাকে আমার বাড়ীর দিকে।

(৩)

জলটা একেবারে নিস্তরঙ্গ। চারিদিকের নীচের আকাশে একটা কমলা রঙ। দূর থেকে ভেসে আসে জাহাজের বাঁশি। দু'জনেই চুপ করে দাঁড়িয়ে। নীরবতা ভাঙার সাহস হচ্ছে না আমাব। আড়চোখে দেখছিলাম নিলয়ের দিকে। একটা শূন্যচোখে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। দু-তিন বার চেষ্টা করলাম। কেমন একটা সংকোচ লাগে। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ার ধাক্কা আসে। আর সেটাই বোধহয় ভেঙে দেয় আমার চটকা। আমি বলে উঠি, কিরে, চুপ করে আছিস কেন? এবার বল। চোখের মণি দুটো একবার জ্বলে উঠেই নিভে যায় নিলয়ের। একটা মোহে পড়ে একাজ করেছিলাম বুঝলি। আসলে মিলি কোনদিনই ভালবাসেনি আমাকে। যেটাকে আমি প্রেম ভেবেছিলাম, সেটা ছিল শুধু আকর্ষণ। আমার ঝকঝকে ড্রেসপরা ক্যাপ্টেনের রূপটাকেই পছন্দ করেছিল ও। এর বাইরে আর কিছু নয়। মনের মধ্যে হাতড়ে দেখিনি কখনও। এটাই সবচেয়ে বড় পরাজয় আমার।

আমি একেবারে চুপ করে থাকি। বলিনা কিছুই। কারণ আজই সঠিক সময়। আজ সমস্ত কথা বলাতেই হবে ওকে দিয়ে। সব বোঝা না হলেও বেশ কিছুটা হালকা করতেই হবে নিলয়ের মন। তাহলেও কিছুটা রিলিফ তো পাবে। সেটাই বা কম কি!

জানিস, বলতে থাকে নিলয়। কোলকাতায় বাড়ীভাড়া নেওয়া তো দেখলি। ভাবলাম এরপর ঠিক হয়ে যাবে। যদিও মনে মনে পুড়ছিলাম। বাড়ীর বড় ছেলে আমি। মা-বাবার প্রতি কর্তব্য ছেড়েও তাদের প্রতি বা ভাইয়ের প্রতি আমার ভালবাসাও কম নয়, তুই তো জানিস। তবুও কমপ্রোমাইজ করলে যদি মিলি সুখী হয়, শান্তি পায় তবে তাই হোক। এটা যে কতবড় ভুল-ভাবনা সেটা তো বুঝতে পারিনি সেদিন। তোকে বলেছিলাম না এসব মেয়েকে ভালবাসা যায়। কিন্তু সংসার এদের নিয়ে করা যায় না। বলতে বলতে গলাটা খাঁকরে নেয় ও। বুঝতে পারি উদ্গত কান্না যাতে বাইরে বেরিয়ে আসতে না পারে সেই চেষ্টাই করছে। আবার বলতে থাকে। কোলকাতায় এসে শুরু হলো নতুন অজুহাত। অফিসের পর মামার দোকানে যাওয়া চলবে না। তুমি আমায় সময় দিচ্ছ না। কি হবে মামার দোকানে বসে। ক-পয়সা দেয় তোমাকে। এগুলো ছাড়। আরও রোজগার যাতে বাড়ে সে চেষ্টা কর। শুধু টাকা। ভাল, আরও ভাল থাকব।

গাড়ী কিনবো। একটা, একটা থেকে দুটো গাড়ী হবে। দু'জন দুটো ইউজ করবো। এ কিরকম মেয়ে নন্দন। মন বলে কোন পদার্থই নেই। আমি তো শুধু স্বামী নই। কারোর ছেলে, কারো ভাই, এগুলোও তো আছে। এসবের কোনো মূল্যই নেই ওর কাছে।

বর্ষাশেষের আকাশে তখন শিম রঙের ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ খেলা করে বেড়াচ্ছে। জলের ছলছল শব্দ, খুব কাছ দিয়ে উড়ে দু'একটা চড়ুই পাখী বা শালিকের ডানা বেয়ে হলদিয়া আবার যেন ফিরে আসে আমাদের দু'জনের কাছে। খস করে একটা শব্দ হয়। নেভা দেশলাই কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে নিলয়। প্রথম সিগারেট ধরানর শব্দটা কিন্তু শুনতে পাইনি। এটাই অবাক লাগে। তখন তো একেবারে শেষ অহরাহ্নে শব্দ বলতে কিছুই ছিল না। এখন তারা ফিরে আসছে। চেপে ধরছে ধীরে ধীরে দু'জনকে তবু বুঝতে পারলাম এটা। দেশলাই-এর শব্দ নয়। ভেঙে যাওয়া নিলয়ের মনের একটুকরো স্ফুলিঙ্গ যেন শেষ আকুতি, শেষ নালিশ জানিয়ে গেল।

অশান্তি বাড়তেই থাকে। চলতে থাকে একতরফা অভিযোগ আর অপরপক্ষ থেকে শুধু মানভঞ্জন আর অনুনয়ের পালা। এতক্ষণ যেন প্রম্পটারের মুখে শোনা ডায়লগের ডেলিভারি ছিল। এবার সেটা সোজাসুজি নায়কের মুখে। আর ভিতরের স্বতঃস্ফূর্ত সংলাপ নিয়ে এল। লয় বেড়ে যায়। যেদিনই মামার দোকান থেকে আসি, রাত্রে ও অন্য ঘরে শোয়। কত বুঝিয়েছি কত বলেছি, কিন্তু না। একটাই শর্ত। ডিশিসনে স্ট্রীক্ট। শুধু তুমি আমাকে নিয়েই থাক। তোর কাছে বলতে সংকোচ নেই নন্দন। তৃপ্ত ও কিছুতেই হয় না যেন। আর অদ্ভুত ব্যাপার। প্রতিবার অন্তরঙ্গতার পরেই আবার সেই একই আব্দার। চাপা কান্নায় গলা কাঁপতে থাকে নিলয়ের। এসবও মানিয়ে নিয়েছিলাম। মামাকে বলেছিলাম যে পাঁচদিনের জায়গায় সপ্তাহে আমি তিনদিন আসব। ভেবেছিলাম এবার শান্তি ফিরে আসবে। নারে নন্দন। ওপরওয়ালাই বিরূপ আমার ওপর। মিলি স্যাটিসফাইড হবার নয়। তুই বলছিলি না আমি এত আনমাইণ্ডফুল হয়ে গেলাম। এই কথাটা শোন এবার। ঠিক পনের দিন আগে আমি গিয়েছিলাম সেক্সপিয়ার সরণীতে। নাগাল্যাণ্ড হাউস থেকে বেরিয়ে সোজা জহরলাল নেহেরু রোডের দিকেই আসছিলাম। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। তখন কেমন গাড়ী বা ট্যাক্সির ভীড় হয় জানিসতো। ট্যাক্সিগুলো হঠাৎ লাল সিগন্যালে দাঁড়িয়ে যেতে লাগল। ঘুরে

রাস্তা পার হতে গিয়েই দেখতে পেলাম। আমার সামনের গাড়িটায় নয়। দাঁড়িয়ে থাকা দু-তিনটে ট্যাক্সির পর একটা ট্যাক্সিতে বসে মিলি। সঙ্গে একটি ছেলে। একেবারে ঘনিষ্ঠ হয়ে একজনের সাথে বসে আছে। এত আলাপে মগ্ন যে কোনদিকে তাকাচ্ছেই না। সঙ্গের ছেলেটিকে আমি চিনি। রূপক। মিলির অফিস কোলিগ। কিরকম প্রবঞ্চনা দেখ। এদিকে আমাকে সময় দিচ্ছ না এসব বলে অভিযোগ করছে। অন্যদিকে রুপকের সঙ্গে দিব্যি একটা প্যারালাল লাইফ তৈরী করে ফেলেছে। দুজন দু'জনের মধ্যে এত মগ্ন যে বাইরে তাকাচ্ছিলই না। ঘাড় ঘোরালেই দেখতে পেত আমাকে। এক মহূর্তের মধ্যে মনে হলো নন্দন, আমার পায়ের তলা থেকে মাটিটা সরে গেল। লজ্জা পাওয়ার কথা ওদের। কিন্তু রাগে ঘেন্নায় সরে পিছিয়ে এলাম আমি নিজেই। বলতে বলতে একেবারে মাটিতে বসে পড়ে নিলয়। এরপর আর কি থাকে জীবনে। নন্দন, আগের জন্মে নিশ্চয়ই অনেক পাপ করেছিলাম। তা না হলে এসব সহ্য কেন করতে হবে আমায়। জানিস বাড়ী ফিরে কিন্তু ওর মধ্যে কোন রিপার্কেশন দেখতে পেলাম না। ভেবেছিলাম। মনে মনে প্রচণ্ড রাগ নিয়েই ফিরেছিলাম। আজ একটা হেস্তনেস্ত করবোই। কিন্তু দরজা খুলে দাঁড়ানো মিলিকে দেখেই ভুলে গেলাম সব। নিজেই প্রবোধ দিলাম নিজের মনকে। হয়তো আমারই চোখের ভুল। রুপক নিশ্চয়ই ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাই এত কাছাকাছি বসেছিল দু'জন। এর মধ্যে অন্যকিছু নাও থাকতে পারে। পিওর ফ্রেণ্ডশিপও তো হতে পারে। পরদিন থেকে আবার চলছিল সবই। সেদিন রাতে মিলি ছিল প্রচণ্ড প্রেমময়ী। আর আমার মধ্যে জমে থাকা নিঃশ্বাসটা ক্রমশই বার হয়ে আসছিল আস্তে আস্তে। তাহলে আমারই ভুল। দড়িকে সাপ ভেবেছি। এসব বলে প্রবোধ দিচ্ছিলাম নিজের মনকে। আবার ফিরে পাচ্ছিলাম নিজের স্বাভাবিকতা। সকালে অফিস। তারপর দোকান। সপ্তাহে অন্তত দু-তিনদিন । টায়ার্ড ফিল করছিলাম না। মন যদি শান্ত থাকে তাহলে শারীরিক পরিশ্রমকে তো কিছু মনেই হয় না। কিন্তু পাঁচদিন আগে যে আঘাতটা দিল মিলি তা একেবারে চুরমার করে দিয়েছে আমায়। অতবড় থাপ্পড় এর আগে কখনও সইতে হয়নি।

আমার ধৈর্য্য আর বাঁধ মানে না। আবার কিসের আঘাত?

আরও কিছু বলেছে নাকি মিলি?

বাঁকের মুখে অর্ধেক ব্রেক কষেই আবার সচল হওয়া মোটরের মত বলতে

থাকে নিলয়, ইদানিং অফিসে সহকর্মীদের সাথে কথাবার্তাটা এড়িয়ে যাচ্ছিলাম। কারণ, সবারই একই কৌতূহল। তোমার মুখ চোখ এরকম লাগছে কেন ব্যানার্জী? কিরে ব্যানার্জী, এত অসুস্থ দেখাচ্ছে কেন? এসব প্রশ্নের মুখোমুখি যতটা সম্ভব পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম আর কি। কিন্তু সেদিনের পরিস্থিতি অন্যরকম ছিল। এরিয়ারের সব টাকাটাই আজ একসঙ্গে দেওয়া হবে, বলেছে ম্যানেজমেন্ট। অফিস জুড়ে খুশির হাওয়া। ঢুকতেই দু-তিনজনের মুখ থেকে সেটাই শুনলাম। আমার প্রতি আলাদা মনোযোগ দেখাচ্ছিল না কেউ। মনে মনে বেশ চিন্তিত বোধ করেছিলাম। ইনচার্জকে বলে একঘন্টা আগেই বেরিয়ে পড়লাম। মিষ্টির প্যাকেট আর ফুলের বোঝা নিয়ে বেশ জোরেই টিপেছিলাম কলিং বেলটা। দরজা খুলে দাঁড়ানো মিলির মুখটাও লক্ষ্য করিনি ভাল করে। উচ্ছ্বাস খানিকটা বল্গাহীন হয়ে পড়েছিল। কাঁধে হাত দিয়ে মিলিকে বললাম, জান! আজ অনেক টাকা এরিয়ার দেওয়ার কথা বলেছে। ফুল আর মিষ্টিটা ধর। আজ বাইরে খেয়ে আসি, কি বল! সেলিব্রেটটা তো করতে হবে। আমার সব উৎসাহ এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিল ও। শরীরটা আমার ভাল নেই। ওগুলো টেবিলে রেখে দাও। বলে ভিতরে চলে গেল ও। অবাক হলেও বললাম না কিছুই। চা শেষ করে কাপটা টেবিলে রাখতেই থমথমে মুখে এঘরে এল মিলি। শোন, একটা কথা আছে। গলার স্বর খুব গম্ভীর। আমি বলতে যাচ্ছিলাম থামিয়ে দিল মিলি। আমি অনেক ভেবে দেখলাম এভাবে আর সম্ভব নয়। তুমি তোমার মামাকে বা তোমার বাড়ী যাওয়া কোনোটাই ছাড়তে পারবে না। একা একা থেকে আমি একেবারে শেষ হয়ে যাচ্ছি। তাই ঠিক করলাম আমাদের ডিভোর্স হয়ে যাওয়াই ভাল। মিলির পরনে বাইরে যাওয়ার সাজ। আমি চললাম। রসা রোডে। এখন থেকে ওখানে থাকবো। আমাকে আর কোনো কথা বলার সুয়োগ না দিয়ে ব্যাগটা টেনে নেয় ও। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে যায় সোজা। বসে থাকি স্থানুর মত। সব কথা, সব ভাষা হারিয়ে গেল। বুঝলি একা ঘরে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎই খুব হাসি পেল। আমি হাসতে লাগলাম। প্রচণ্ড জোরে। কার প্রতি বা কিজন্য হাসছিলাম কে জানে? আসলে জানিস, কোন কোন সময় ভেতরের জমাট বাঁধা কান্নাগুলো বোধহয় হাসির মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসে। এতদিন নাটক নভেলে পড়েছি। সিনেমা থিয়েটারে দেখেছি। সেগুলো জীবন থেকে নেওয়া হয়। সেদিন একথা বুঝলাম আরও ভাল করে।

(৪)

জীবনের অলিন্দ থেকে বিদায় নিয়েছে আরো কয়েকটা বসন্ত। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরা হয়েছি শিশু থেকে কিশোর, যুবক থেকে প্রৌঢ়। সংসারের আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে আরও হয়েছি কঠিন। ছেলেমেয়ের লেখাপড়া আর তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক বিষয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের হারও কমে গেছে খুবই। আর দেখা না হলে তো যোগাযোগের সূত্রটাও ক্ষীণ হয়ে আসে। আসা যাওয়ার পথে প্রথম যখন আসি তখন প্রথম সখ্যতার শরিকদের একেবারে চোখে হারাতাম। এ অভ্যাস ছাড়িয়ে গিয়েছিল আমাদের গোটা ব্যাচটার মধ্যেই। এটাই বোধহয় যুগে যুগে ঘটে। হয় কতরকমের ছেলেমানুষি। একসঙ্গে নেওয়া হয় কত শপথ। চিরকাল একসঙ্গে থাকার, সুখে-দুঃখে একে অপবের সাথে কাঁধ মেলাবার নেওয়া হয় কত না অঙ্গীকার। কৈশোরে বা প্রথম যৌবনে আমরা সবাই তো রূপকথার রাজকুমার। কাজেই মনটাও থাকে রাজার মতই দরাজ। তারপরে বাস্তবের কঠোর আঘাতে সম্বিত ফেরে। সত্যি বলতে কি মাথা থেকে বেরিয়ে গেছিল নিলয়ের বিষয়। কোম্পানীতে নতুন নতুন উইংস খোলা হচ্ছে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আমার কাজের পরিসর। এখন আর ছুটি বলে কিছু নেই। রবিবারেও বেরোতে হয়। সাইটে যেতে হয়। সুপারভাইজারদের কাজ দেখে তাদের নির্দেশগুলো দিয়ে আবার এসে বসতে হয় অফিসে। কারখানার নতুন শেড থেকে প্রায় দশ বার কিলোমিটার দূরে। পাশাপাশি আয়কর বিক্রয়করের নিত্যনতুন আবদার। তাদের সঙ্গে পাওনাগণ্ডার দড়ি টানাটানি। কদাচিৎ একান্ত দুর্লভ অবকাশের ক্ষণে দু-একজন বন্ধুবান্ধবের দেখা বা পাঁচ-সাত মিনিট কথা হলেও কেবলই ঘুরে ফিরে আসে কাজ বা অফিসের প্রসঙ্গ। এমনই এক প্রচণ্ড ব্যাস্ততার দিনে ডেলি প্যাসেঞ্জারের চাদরটা হঠাৎই খসে পড়ল গা থেকে। আটটা কুড়ির লোকালটাই ধরি আমি। এখন স্টেশনে পৌছাই মিনিট দশেক আগেই। যে অফিসযাত্রীর দল আমার সাথে এই ট্রেনটায় যায় তারা এই আগে আসার বিষয়টি নিয়ে একটু কৌতুক করে থাকে। নন্দন এত আগে আসে কেন? তোমার ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে অফিসে ঢোকার ব্যাপারে সরকারী কর্মচারীরাও লজ্জা পাবে। এইসব কথা ঠাট্টার সুরে হলেও শুনতে হয় আমায়। তর্কবিতর্কে যাই না। কারণ ট্রেন আসার ঠিক আগের মুহূর্তে স্টেশনে এসে উর্ধ্বশ্বাসে পড়িমরি করে সিঁড়ি দিয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে

দৌড়ানর ব্যাপারটা আমার কোনকালেই পছন্দ নয়। কিন্তু আজ আর কারোরই ব্যস্ততার কোন জায়গা নেই। মাইকে ঘোষণা হচ্ছে, লিলুয়া স্টেশনে অবরোধের ফলে গাড়ী 'সঠিক' সময়ে ছাড়া যাচ্ছে না। কখন ট্রেন চলবে তাও বলা যাচ্ছে না। প্ল্যাটফর্ম জুড়ে নানারকম জল্পনাকল্পনা। কি করবো ভাবছিলাম। দু-এক পা এগিয়ে পাইচারি করার মধ্যেই দেখলাম বীরেশকে। পেপার স্টলের পাশে দাঁড়িয়ে। মনটা ভাল লাগে আমার। অনেক দিন পর দেখা। বীরেশ আমাদের কমন ফ্রেণ্ড। জি. টি. রোডের ধারে বাড়ী। কিন্তু ওতো আরও আগের ট্রেনে যায়। আজ তাহলে যাত্রীবিক্ষোভটা চলছে অনেকক্ষণ ধরেই। তা না হলে ওর এখন এখানে থাকার কথা নয়। এগিয়ে গিয়ে ডাকতেই ফিরে তাকিয়ে দরাজ গলায় হেসে ওঠে বীরেশ। আরে, আরে! একি! তুই তো আজকাল একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে গেছিস। অভিযোগটা উড়িয়ে দিই আমি। নিজের দোষ চাপতে আগেই এ্যাটাক করছিস, কি বল! কেন দোষটা কি আমার, বীরেশ ছেলেমানুষের মত ঘুঁসি পাকায়। একবার খোঁজও তো নিসনা যে নন্দন বেঁচে আছে না নেই। উচ্ছ্বলিত উচ্ছ্বাসে উড়ে যায় অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগের পালা। ইতিমধ্যে দোকান থেকে দু-ভাঁড় চা নিয়ে আসে বীরেশ। চুমুক দিয়ে বলি, তা অফিসটা আজ কি করা যায় বলতো? বীরেশের উত্তরের আগেই ফয়সালা হয়ে যায় স্টেশন মাস্টারের ঘর থেকে। 'এইমাত্র খবর পাওয়া গেল লিলুয়া স্টেশনের কাছে একদল বিক্ষোভকারী দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের প্যান্টোগ্রাফ খুলে দিয়েছে।' ঘোষণা শুনে হেসে উঠি দু'জনেই। প্যান্টোগ্রাফ খুলে দেওয়ার মানে আগামী বার ঘন্টার জন্য 'নিশ্চিন্ত'। ট্রেন চলার কোন সম্ভাবনা নেই। ফেরীঘাট পার হয়ে শিয়ালদা হয়ে যাবার কথা একেবারেই আমল দেয় না বীরেশ। এই অফিস অফিস বাতিকটা আজ একটু বাদ দে। আজ তোকে ছাড়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। চল চল ক্লাবে যাই। বলতে বলতে জোর করেই আমাকে প্ল্যাটফর্মের বাইরে নিয়ে আসে বীরেশ। একটু ইতস্তত বোধ করছিলাম। তারপর ঝেড়ে ফেলি সে ভাবটা। সত্যি—বছরে এক আধবার নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়া খারাপ নয়। ক্লাবঘরের সামনে ঘেরা জায়গা। কোণের দিকে একটা বেঞ্চে বসি দু'জনে। রেল অবরোধের বিষয়টা ইতিমধ্যেই চাউর হয়ে গেছে এখানে। ক্লাবঘরে পুরোমাত্রায় চলেছে তাস, ক্যারাম, আড্ডার আসর। বাইরে কেউ নেই। শুধু আমবা দু'জন বসে। খুলে যায় স্মৃতির ঝাঁপি। এলোমেলো কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে সময় কেটে

যাচ্ছিল। এর মধ্যেই এসে পড়ে নিলয় আর মিলির কথা। বীরেশের স্বতঃস্ফূর্ততা হঠাৎ যেন ধাক্কা খেয়ে থেমে যায়। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে বীরেশ। তারপরে আস্তে আস্তে আবার মুখ খোলে। সত্যি নন্দন, নিলয়ের মত ছেলের এরকম অবস্থা একেবারে ভাবাই যায় না। কি কপাল বলতো। এত ব্রাইট। এত ব্রডমাইণ্ডেড ছেলে। কি অবস্থা আজ। আমি সমর্থন করি ওকে। দেখ, এইজন্যেই বোধহয় বলে লাভম্যারেজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুখের হয় না। রীতিমত রেগে যায় বীরেশ। এটা বিয়ে বিয়ে খেলা। নিলয়ের দিক থেকে যতটা গভীরতা ছিল বা এখনও আছে। মিলির দিক থেকে তার ছিটেফোঁটাও নেই। তুই-ই বল না।

কথাটা ঠিকই বলেছিস। সায় দিই আমি। কি সুন্দর ভাবে ওকে এক্সপ্লয়েট করে গেল মিলি। এরকম স্বার্থপর একগুঁয়ে মেয়ে আমি খুব কমই দেখেছি।

আচ্ছা, প্রশ্ন করে বীরেশ। ডিভোর্স কি করে এত তাড়াতাড়ি পেয়ে গেল মিলি? তুইতো জানিস। কি ব্যাপার হয়েছিল বলতো?

তাড়াতাড়ি তো পাবেই। এক্সপারটি ডিশিসন হয়েছে। নিলয় তো এ্যাপিয়ারই করেনি।

তা তুই ওকে কিছু বলিসনি? এটাতো ঘোর অন্যায়। একজনের দুর্বলতা আর ভালমানুষীর সুয়োগ নিয়ে যথেচ্ছাচার? রাগে কাঁপতে থাকে বীরেশ। পড়তো আমার পাল্লায়। বুঝিয়ে দিতাম কত ধানে কত চাল।

আসলে নিলয় একেবারে অন্ধ ভালবাসার শিকার। বুঝলি বীরেশ। আমি ওকে অনেক বলেছিলাম। বুঝিয়েছিলামও অনেক। নিলয় কোন কথাই শোনেনি। মেয়ের কাস্টডিটাও কেমন অবলীলাক্রমে পেয়ে গেল মিলি। শুধু তাই নয় অ্যালিমনি আদায় করার মতলবেও ছিল। জানাই আমি।

সে কি! অ্যালিমনি। এর মধ্যে আবার এ্যালিমনির প্রশ্ন আসে কোথা থেকে? এসব মেয়েদের হিউম্যানিটি বলে কোন ব্যাপারও নেই। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায় বীরেশ।

আমি বসিয়ে দিই ওকে। এ্যালিমনি কোর্টে ডিমাণ্ড করেনি। আলাদা ভাবে নিলয়কে বুঝিয়ে আদায় করার তাল করছিল।

তারপর? জিজ্ঞাসা করে বীরেশ?

তারপর আর কি? জানতে পেরে মিলির দিদি আর বোনেরা প্রচণ্ড রাগারাগি করে। এমনিতে ফ্যামিলির অন্যরা ওর আচরণে খুব ক্ষুব্ধ ছিল। নিলয়কে ওরা

খুব ভালও বাসত। ওদের সবার রাগারাগি চেঁচামেচিতে আর টাকা আদায় করার সুয়োগ পায়নি মিলি। সত্যি মেয়েমানুষ যদি নীচে নামতে শুরু করে, তাহলে যে কোথায় গিয়ে থামবে কেউ বলতে পারে না। আমার মনের দুঃখটা যেন বাঁধভাঙা ভাবে বেরিয়ে আসে। আরও জানিস, রুপকের সাথে এখন চুটিয়ে চলছে লীভটুগেদার। নিজে সরকারী কর্মচারী হয়ে এসব ব্যভিচার করে বেড়ালে আইনঘটিত সমস্যায় পড়ে চাকরিটাই চলে যায়। কিন্তু নিলয়ের জন্য সেটাতো হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। উড়ে এসে কোথা থেকে নিলয়ের লাইফটা হেল করে দিয়ে গেল।

কপালের লিখন। বুঝলি নন্দন। একে খণ্ডানোর সাধ্য কারোর নেই। যাক তোর সাথে দেখা হয়ে খুব ভাল লাগল। অনেকদিন পরে প্রচুর আড্ডা হলো, কি বল! আর দেখ! এমন একটা সমস্যা যে সমাধান করার রাস্তাটা তোর আমার কারোরই জানা নেই। কিছু করার থাকলে সত্যি বলছি, আমি বা তুই চুপ করে থাকতাম না।

ফিরতে থাকি বাড়ীর দিকে। অপ্রত্যাশিত বিশ্রাম আজ বহুদিন পরে। নিস্তব্ধ দুপুরের একটা আলাদা রূপ আছে। প্রায় ভুলতে বসেছিলাম এটা। অন্যদিন কোলাহলমুখরিত কোলকাতায় প্রকৃতির এ অবস্থা তো চোখে পড়ার কোন উপায়ই নেই। হঠাৎ যেন প্রবল একটা মমত্ব অনুভব করি আমার পল্লী, আমার এই আধা শহরটার প্রতি।

(৫)

আবার হলদিয়া। এবারের আসাটা একবারেই শিডিউলের মধ্যে ছিল না। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে শিল্পদ্যোগীদের এখানে জমি দেওয়া হচ্ছে। শিল্প তৈরীর জন্য। বিশেষ করে ক্ষুদ্রশিল্প বা এস. এস. আই.—কে খুবই উৎসাহ দেওয়া হচ্ছিল এখানে ইউনিট করার জন্য। আমার অফিস থেকে ফ্যাকট্রি এক্সপানশনের জন্য বেশ কিছুদিন ধরে উপযুক্ত জায়গা খোঁজা হচ্ছিল। তবে বস বলেছিলেন কোলকাতা বা শহরতলীতে নয়। নতুন শেড করতে হলে তা হবে অন্তত মহানগরী থেকে পঞ্চাশ যাট কিলোমিটার দূরে। এভাবে কথাপ্রসঙ্গে এসে গেছিল হলদিয়ার কথা। কর্তারা সম্মতি দিলেন সাথে সাথেই। তারপর সোজা চলে আসি হলদিয়ায়। নিলয় এখন এখানেই স্থায়ীভাবে বাস করছে। কোম্পানী থেকে ভি. আর. এস. নিয়ে এখানে সিভিল কনট্রাক্টরের কাজ করছে। এ ব্যাপারে ওর দক্ষতা ছিল প্রথম থেকেই। ওই টাউনশিপটা নতুন তৈরী হচ্ছে। এরজন্য লোকাল অথরিটি এমন একটা গ্রুপ অফ সিভিল কনট্রাক্টারের খোঁজ করছিল যারা খাতা কলমে বিরাট ডিগ্রিহোল্ডার না হলেও অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট। নিলয়ের ডেভলপমেন্ট প্রোজেক্ট এদের এত পছন্দ হয়েছিল, যে এরা এর সঙ্গে লিখিত কনট্র্যাকট করে নিয়েছে। থাকার জন প্রয়োজনীয় কোয়াটার দিয়েছে ওকে। আমি এখানে এসে হোটেলে উঠেছিলাম। তারপর দেখা করেছিলাম ওর সঙ্গে। আমাকে দেখে যৎপরোনাস্তি খুশী হয়েছিল সে। বলা যায় যেন সব জীর্ণতার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। দস্তুরমতো এ্যাগ্রেসিভ মুডে আমার দিকে ধেয়ে এসেছিল। এখানে এসে তুই হোটেলে উঠলি কি বলে। এটা কি ইয়ার্কি হচ্ছে। নিলয়ের আক্রমণের সামনে আমি তখন একেবারে সংকুচিত। আমতা আমতা করছিলাম। না, মানে অফিস থেকে তো হোটেল এ্যালটমেন্ট করেছে। 'আরে রাখ তো এ্যালটমেন্ট', একেবারে উড়িয়ে দিয়েছিল নিলয়। আমার নিজের জায়গা থাকতে তুই উঠেছিস কিনা হোটেলে। মারধর খাবার ইচ্ছে হয়েছে নাকি! আমি খানিকটা রক্ষাণাত্মক ভঙ্গীতে পরিস্থিতি সামাল দেবার চেষ্টায় ছিলাম। কিন্তু কিছুই শোনেনি ও। তোর সুটকেশ দুটো কই! প্যাক কর প্যাক কর। বলতে বলতে ইতি-উতি চাইছিল নিলয়। কোণে দাঁড় করানো জিনিস দুটো দেখতে পেয়েই আর দেরী করেনি। এগিয়ে গিয়ে তুলে নিয়েছে। লক খুলে আবার বন্ধ করে আমার দিকে তাকায়। সবইতো এর মধ্যে আছে।

কিরে! তাহলে আর দেরী কেন? চেক আউট করে ফেল। বুঝেছিলাম আমার সঙ্গ কামনায় অধীর হয়ে আছে নিলয়। তাই আর ওজরআপত্তি তুলিনি রিশেপসনিষ্ট একটু অবাক চোখে তাকালেও বলেনি কিছু। প্রফেশনাল এথিকসে বাধে নিশ্চয়ই। তখনও দুটো বাজেনি। এরমধ্যেই সোজা আর হতে দিইনি। খানিকটা জোরজবরদস্তি ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম কাছেরই একটা হোটেলে। দুপুরের খাওয়াটা ওখানেই সারা হলো। বিল দেওয়া নিয়েও কিছুক্ষণ কাড়াকাড়ি। ঘরে এসে ঘুমাইনি দু'জনের কেউই। যথেষ্ট ক্লান্তি থাকলেও আমল দিইনি তাকে। আসলে নিজের একান্ত ভাললাগা মন্দলাগাগুলো আমি ছাড়া আর কারুর সাথে ভাগ করতে পারে না নিলয়। এটা আমি ভাল করেই বুঝি। মিলির কথা বা রুপকের খবর সরাসরি জানতে চাইনি আমি। কৌতূহল যথেষ্ট থাকলেও চাপা দিয়ে রেখেছিলাম তাকে। অপেক্ষা করছিলাম কখন বলবে নিলয় নিজের থেকেই। বিকেলের চা টা ও নিজেই বানাল। এর কুক কাম সার্ভেন্ট এদিন আসেনি। চা খাওয়ার মাঝেই প্রস্তাব দিল ও। যুগোশ্লাভিয়া থেকে একটা বড় জাহাজ আজই এখানকার পোর্টে এসেছে। ক্রুড অয়েলের জাহাজ। চল নন্দন— আজই ওটা দেখে আসি। আমি রাজি হয়ে যাই। জাহাজটার বাইরের ডেকরেশন অপূর্ব। নিলয় আরও জানায়। ঠিক হয় সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আমরা ডকে যাব।

জেটির ওপর পাতা একটা বড় লোহার পাইপের ওপর আমি আর নিলয় বসেছিলাম পাশাপাশি। শ-দুয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে বিশাল লৌহতরী। জঠরে পেট্রোলিয়াম অয়েল। এতক্ষণ সে বিষয়েই কথা হচ্ছিল। ফ্যাকট্রি এক্সপানশনের বিষয়েও খুব উৎসাহ দেখিয়েছে নিলয়। প্রয়োজনীয় ফিনান্স স্থানীয় ব্যাঙ্ক থেকে ও নিজেই ব্যবস্থা করে দেবে। বলেছে একথাও। তারপর একসময় ঘুরেফিরে ঠিক চলে এসছে মিলি আর রুপকের প্রসঙ্গ। বিবাহবিচ্ছেদের কিছুদিন পরে মেয়ে মিতুনকে হোষ্টেলে ভর্তি করে দিয়েছে মিলি। রুপক নাকি "মিলির" মেয়েকে সঙ্গে রাখতে রাজী নয়। জানিস নন্দন, খবর পেয়ে আমি হোষ্টেলে ওকে দেখতে গিয়েছিলাম। মিতুনের স্কুল আর হোষ্টেল একই কমপাউণ্ডে। সেদিন স্কুল ছুটি ছিল। মিতুনটা দেখতে খুব মিষ্টি হয়েছে জানিস। আমার সন্তান বলে বলছি না, দেখতেও অপূর্ব সুন্দরী হয়েছে। সেদিন হোষ্টেলে এসেছিল মিলিও। আমি বলেছিলাম, যে হোষ্টেলের খরচাটা আমিই দোবো। মিলি রাজী

নয়। মেয়ের লেখাপড়ার খরচ অন্য কারোর কাছ থেকে নেবেনা ও। পরে আরেকবার প্রিন্সিপালকে ফোন করেছিলাম। তিনি জানালেন মিতুনের 'লিগাল' গার্জেন বলে দিয়েছে। ওর কোন খরচা যেন অন্য কারোর কাছ থেকে না নেওয়া হয়। নিলয়ের মুখ থেকে জানতে পারি দ্বিতীয় বিবাহিত জীবন ভালই কাটছে মিলির। স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে অফিস যায়। ফেরেও একসঙ্গে। এর পরের কথাটা শুনে একেবারে বজ্রাহত হয়ে যাই। সন্তোষপুরের দিকে মিলি একটা ফ্ল্যাট বুক করেছে। এরজন্য কিছু টাকা কম পড়াতে এল. আই. সি.-র এজেন্সি নিয়েছে। দিন পনের আগে হঠাৎই বিকেল বেলায় নিলয়ের কাছে এসেছিল। কিছু ক্লায়েন্ট জোগাড় করে দেবার জন্য। জানিস নন্দন, সেদিন মিলির খুব তাড়া ছিল। বারবার বলছিল সে আজই কোলকাতায় ফিরবে। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আমি বললাম আজ তুমি যেওনা। রাত হয়ে যাবে। এতটা পথ একা একটা মহিলার পক্ষে একেবারেই নিরাপদ নয়। ও কি বলল জানিস। থাকতে পারি, তবে একটা শর্ত আছে। আমি আলাদা ঘরে থাকবো। আর কোন অবস্থাতেই তুমি আমায় টাচ করার চেষ্টা করবে না। কারণ রূপককে আমি 'অগ্নিসাক্ষী' করে বিয়ে করেছি। তার প্রতি সৎ থাকার আমার তো একটা দায়িত্ব আছে। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াই আমি। পরিষ্কার বুঝে যাই যে, একে আর রক্ষা করা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। একেবারে নিশ্চিত সর্বনাশের পথে এগিয়ে চলেছে ও। মিলির পক্ষে এ খেলায় লাভ ছাড়া আর কিছু নেই।

পিজির গেটে ঢুকে ট্যাক্সিটা ব্রেক কষতেই নেমে পড়ি আমি। ফেরত পয়সাটা আর নিই না ড্রাইভারের কাছ থেকে। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকি। অফিসেই খবরটা পেয়েছি। স্কুটার এ্যাকসিডেন্ট করেছে নিলয়। রায়চক থেকে আসছিল কোলকাতায়। অবাক হবার মত খবর। নিলয় একেবারে ওস্তাদ রাইডার। গাড়ী নিয়ে বহুবার দার্জিলিং, গ্যাংটক এমনকি দিল্লী পর্যন্তও গেছে। পাড়ি দিয়েছে বহু দুর্গম পথ। সেই মানুষ কোলকাতার রাস্তায় কি করে এ্যাকসিডেন্ট করে, কে জানে! বেডে শুয়ে নিলয়। আপাদমস্তক ব্যাণ্ডেজ করা। জানতে পারলাম এমনিতে তেমন ভয়ের কারণ নেই। তবে পায়ের হাড় বা পাঁজর হয়ে গেছে বেশ কয়েক টুকরো। এখন বেশ কিছুদিন থাকতে হবে। চেহারাটা ভাল হাওয়ায় অনেকটা বেঁচে গেছে নিলয়। খুব আস্তে কথা বলছিল

ও। ভিজিটার বলতে তখনও আমি একাই। আর কেউ আসেনি। ঈশারায় আমাকে কাছে ডাকে নিলয়। ওর দিকে ঝুকতেই এগিয়ে দেয় একটা মুখবন্ধ বড় খাম। ব্যাগের মধ্যে রেখে দিই সেটা। আর মিনিট পাঁচেক পরেই দেখি মিলি আসছে। সোজা এসে বেডের পাশে রাখা টুল টেনে বসে ও। ভাবভঙ্গীটা একই। সেরকমই বেপরোয়া। জিজ্ঞাসা করি, কেমন আছ মিলি? ভাল। আপনি ভাল আছেন? স্মিত হেসে বলে দেয় সে। আরো দু-একটা কথাবার্তার মাঝে শেষ হয়ে যায় ভিজিটিং আওয়ার্স। নীচে নেমে কিছু বলার আগেই দ্রুত বিদায় নিয়ে গেটের বাইরে চলে যায় মিলি। বুঝতে পারি, আমার সঙ্গে একান্তে মুখোমুখি হতে চায় না ও।

(৬)

পারাপারহীন অন্ধকার নদীর ঘাটে একা কোন যাত্রী যেভাবে অচেনা নদীর দিকে তাকায় আমিও সেই দৃষ্টিতে যেন আজ জীবন আর ভবিতব্যকে দেখার দৃষ্টি অনুভব করলাম। আধো ঘুমের মধ্যে এই স্বপ্নটাই বারবার ঘুরোফিরে আসছিল। আমি আর নিলয় যেন এইরকম এক নদীর ঘাটে। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি অন্ধকার জলের দিকে। ও সামনে আমি পিছনে। কি আশ্চর্য! এর মধ্যে একটা বোধ যেন কাজ করে চলেছে। ওর সাথে এখানে আমি কেন? প্রশ্নটা কে যেন ফিসফিস করে বলছে আমার কানের কাছে। এটা তোমার নয়। এখানে জায়গা নেই তোমার। ফিরে যাও। ফিরে যাও। কি এটা? অবচেতন মন? কিন্তু সে তো স্বপ্নেরই অভিব্যক্তি। এরমধ্যে আলাদা করে সে আসে কি করে? হঠাৎ সামনের দিকে তাকিয়েও শিউরে উঠি। এই শরীরটা একটা ঘোর লাগা অবস্থায় সোজা নেমে যাচ্ছে জলের মধ্যে। উঃ! কি কালো জল। এটাতো গঙ্গা নয়। গঙ্গার জল এতো তো কালো হয় না। আমাকে যেন কে জোর করে গেঁথে দিয়েছে মাটির সঙ্গে। হাত দুটো অবশ। আমি চাইছি ডাকতে । প্রাণপণ চিৎকার করে ওকে বারণ করতে। কিন্তু পারছি না। শব্দ বেরোয় না। কোনো আওয়াজই বেরোয় না গলা দিয়ে। দূর-—অনেক দূর থেকে কে যেন ডাকছে। স্বরটা ক্ষীণভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছে। একবার শুনে আর পাচ্ছি না শুনতে। না না। ওই তো আবার। স্পষ্টভাবে কে ডাকে। খুব কাছে। একেবারে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। শরীর স্পর্শ। এক ঝটকায় খুলে যায় চোখ। সামনে দাঁড়িয়ে মা। বুকের ওপর হাত রেখে শুয়েছিস কেন? স্বপ্ন দেখে গোঙাচ্ছিস খালি। আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি মার দিকে। ঠিক যেন বোধগম্য হয় না। এতক্ষণ তাহলে কি দেখলাম ? নে, উঠে পড়। শীতের দিনে আর শুলে শরীর খারাপ করবে। চোখে মুখে জল দিয়ে আয়। চা হয়ে গেছে। এক লহমায় মনে পড়ে যায় সব। অডিট ফাইলগুলো নিয়ে এসেছিলাম কালকে। অনেক রাত অবধি কাজ করেছিলাম। বলাই আছে অফিসে। আজ বারোটায় ঢুকবো। কাল শুয়েছিলাম কখন? ও, মনে পড়েছে ! প্রায় রাত দুটো। তাই ঘুমটা আর যথাসময়ে ভাঙেনি। দু'একবার আড়োমোড়া ভেঙে উঠে বসি। ঘড়িতে নটার ঘন্টা। এবার আস্তে আস্তে রেডি হতে হবে। আজ অনেক কাজ। অফিস থেকে ফিরতে দেরি হবে। এসে বসতে হবে আগামী বার্ষিক উৎসবের মিটিং-এ। সামলাতে হবে নানারকমের বাদানুবাদ।

মেটাতে হবে অনেক মান-অভিমানের পালা। ক্যাশিয়ার গজগজ করছিল। অডিটার দু'জন গুজরাটি। ঘোরতর নিরামিষাসী। আপেল আঙুর কলা ইত্যাদি দিয়ে লাঞ্চ সারছে গত দু'দিন ধরে। ক্যাশিয়ারের রাগের কারণটা বুঝি। কিন্তু কিছু বলার তো নেই। এ কদিন ওরা কোম্পানীর জামাই। যা চাইবে দিতে হবে তাই। অডিটাররা অবশেষে বিদায় নিল সেদিনের মতো। একটু হাঁপ ছাড়া গেল। তারপরেই একটা সারপ্রাইজ; হ্যাঁ, তাছাড়া আর কিছুই নয়। পরে অনেক চিন্তাভাবনা করেছি। নারীর নৃত্যকে বা লীলায়িত ভঙ্গীকে লাস্য বলা হয়। সেদিনের সে দৃশ্যের সঙ্গে এক তাণ্ডবের ঘূর্ণি অবশ্যই ছিল। সেদিন নিলয় এসেছিল আমার অফিসে। বলল, এতদিন একেবারে সময় হচ্ছিল না। এতো ট্যুরের চাপ, বুঝলি। গলার স্বর স্বাভাবিক। আমি বেশ খুশিই হয়েছিলাম। ওর দাম্পত্যজীবন, অর্থাৎ দাম্পত্য শব্দের প্রতি বিদ্রুপ সৃষ্টিকারী জীবনসঙ্গিনীর প্রসঙ্গে ওঠেনি কোনো কথাই। কিন্তু একেবারেই ভুল ছিল আমার ধারণা। চা-টা শেষ করেই আবার সেই কথায় যায় নিলয়। টাইম হয়ে গেছে নন্দন। মিলি এখনি এসে পড়বে। আমি সচকিত হয়ে উঠি। —হ্যাঁ। আমার সাথে ফোনে কথা হয়েছে। ওর সেই এল. আই. সি-র পলিসির ব্যাপারে। প্রোপোজাল ফর্মগুলো সব হয়ে গেছে। মানে পার্টিরা করে দিয়েছে আরকি। আমি চুপ করে থাকি। এখানে যখন আসতে বলেছে তখন ও ব্যাপারে একটা ফাইনালাইস নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু পলিসির টাকার ব্যাপারে কি হবে কে জানে। এ আশঙ্কাটা মনে আসে। কিন্তু মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারি না ওকে। ইতস্তত করে খানিকটা জোর চেষ্টা করি। সে সুযোগ আর মেলে না। দরজা খুলে ঘরে ঢোকে মিলি। একুট হাসির ভাব মুখে। আমার দিকে তাকায়। তারপরে সোজা চেয়ারে।

—নন্দনদা আর আমার খবর নেন না। একটা স্তিমিত অনুযোগের সুর ওর গলায়। গলাটা একটু বাঁকিয়ে এরপর নিলয়ের দিকে তাকায় ও। আশ্চর্য হয়ে যাই নিলয়ের মুখ দেখে। কোনো অভিযোগের চিহ্ন নেই সেখানে। যেন এক সহজ দাম্পত্য অংশীদার দু'জনের অনায়াস আলাপের ছায়া সেখানে। চায়ের প্রসঙ্গে আপত্তি তোলে মিলি। —না, নন্দনদা, আজ আগেই তিন-চার কাপ হয়ে গেছে। এখন আর খাব না। আমি এবার একটু ফরমাল হয়ে পড়ি। জানতে চাই রূপকের কথা। মিলির নতুন শাশুড়ীর কথাও। সংকোচও বোধ হয় খানিকটা। নিলয়ের সামনে এসব কথা না তুললেই হতো। কিন্তু সেসব আসে

না। রুপকের মা এ বিয়ে মেনে নেননি—জানায় মিলি। বাবা নেই ওর। অনেকদিন আগেই মারা গেছেন। আমাদের থামায় নিলয়। —যাক এবার বাদ দে। মিলি, এই নাও। ব্যাগ খুলে প্রোপোজাল ফর্মগুলো বের করে ও। অন্য চেনটা খুলে বেরিয়ে আসে একটা চেকের বাণ্ডিল। আমি স্তব্ধ হয়ে থাকি। —ইয়ার এণ্ডিং-এর মাস তো। পার্টিরা পেমেন্ট সব আগস্ট-সেপ্টেম্বর নাগাদ করবে বলেছে। বেশ অস্বস্তি নিলয়ের গলার স্বরে। — এদিকে মিলিরও এমাসের মধ্যে কোটা দিতে হবে। বিষয়টা একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায় আমার কাছে।—তা তোমার টার্গেট কত? মিলির দিকে ফিরি আমি। —টোটাল পলিসি ভ্যালু। মানে সাম এ্যাসিওরড বিশ লাখ টাকা। প্রিমিয়াম ভ্যালু পঁচানব্বই হাজার। —বেয়ারার চেক দিয়েছিস তো নিলয়। একাউন্ট পেয়ির তো অনেক অসুবিধা। গলার শ্লেষ আর চাপা থাকে না আমার।

—তা নিয়ে কোন অসুবিধা হবে না মনে হয়। বলতে বলতে একটু তাড়াতাড়িই যেন উঠে দাঁড়ায় নিলয়। —মামার কাছে আজ একবার যেতে হবে। আমি চলি রে নন্দন। ততক্ষণে চেকগুলো ব্যাগে ভরে ফেলেছে মিলি। —আসি দাদা। একবারও তো এলেন না আমাদের বাড়ী। উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে দরজা খুলে বেরিয়ে যায়। অনুসরণ করে নিলয়ও। আবার স্তব্ধতা ফিরে আসে আমার অফিস ঘরে, পাখাটা চলছে। একদৃষ্টে চেয়ে থাকি তার দিকে। স্টেনো আসে। অফিস আওয়ার্স শেষ। বাড়ী যাবার কথা বলে। আমি শুধু হাত তুলি। কথা বলিনা। মোহ মানুষের জীবনে একটা স্বাভাবিক ক্রিয়া। কিন্তু মোহান্ধতার কুয়াশাকে এভাবে রৌদ্র ঝলকের শেষবিন্দু শুষে নেওয়ার ব্যাপার আগে দেখিনি কখনও। কেমন যেন ভয় করতে থাকে আমার। কাঁচের ভিতর দিয়ে অফিস করিডোরটাকে মনে হয় যেন একটা এ্যাকোরিয়াম। কালো—একেবারে মিশকালো। ওর মধ্যে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা গোলাপী অক্টোপাশ। ওখানে পা দিলেই ওর একটা বাহু চেপে ধরবে আমাকে। একেবারে গ্রাস করে ফেলবে আমাকে। এরকম হয় কেন। ভেবে পাই না কিছুতেই। ধুর! এসব কি ভাবছি। জোর করে উঠে দাঁড়াই। দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে আসি করিডোরে। কেউ নেই। বিশাল হলঘরটা নিস্তব্ধ। সারি সারি চেয়ার টেবিলগুলো কেমন ঘাড় গুঁজে রয়েছে। ওদের পেরিয়ে এগিয়ে যাই দরজার দিকে। দারোয়ান সেলাম করে। ফুটপাতে এক মহূর্ত দাঁড়াই। ফার্নিচারের কি ভাষা আছে? তা নাহলে হলটা

পেরোবার সময় মনে হচ্ছিল কেন ওরা বলছে, তুমি পারনি। তুমি পারবে না।

আধখানা চাঁদের আলোয় নারকোল গাছের পাতাগুলোর থেকে একটা শব্দ আসছিল সরসর করে। ছাদের ওপর সন্ধ্যার পরে বসতে আমার খুব ভাল লাগে। গ্রীষ্মের ভয়ংকর তেজ এখন নেই। এলোমেলো বইছে বাতাস। একটু আগেই ফিরেছি পি. জি. থেকে। অফিসে ফোনটা এসেছিল। তিনটে নাগাদ। এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে নিলয়ের। রেড রোডে। বাইক নিয়ে ফিরছিল হলদিয়া থেকে। প্রাইভেট কারের সঙ্গে ধাক্কা। গাড়ীর ড্রাইভার বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল অনেক। সেজন্যই মুখোমুখি লাগেনি। আবার, এ্যাকসিডেণ্ট, খবর পেতেই আর দেরী করিনি আমি। সোজা হাসপাতালে। ওর মত দক্ষ ড্রাইডারের আবারও এরকম একটা দুর্ঘটনার শিকার হওয়াটা একেবারে বিস্ময়কর। তবে এটা একেবারে অনভিপ্রেত নয়। আমি জেনেছি। বন্ধুর কাছে, প্রেমিকার কাছে, স্ত্রীর কাছে এমনকি মায়ের কাছ থেকে আঘাত পেলেও হয়তো মানুষ সহ্য করে। কিন্তু সন্তান তার নিজের ঔরসজাত। নিজের রক্তের প্রতিকৃতি। তার সমস্ত শুভকামনার ফল। সে যদি এমন আঘাত দেয় নিজের জন্মদাতাকে। এ ধাক্কা সামলান বোধকরি একপ্রকার অসম্ভব। সেটাই পেয়েছিল নিলয়। ওর মেয়ে মিতুনের কাছ থেকে। একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছিল ও। মানসিক যন্ত্রণা এত তোলপাড় করেছিল যে আত্মনিয়ন্ত্রণটা একেবারেই হারিয়ে ছিল নিলয়। সেই অন্যমনস্কতা থেকেই আজকের এই এ্যাকসিডেন্ট। এ কেমন বিচার। কিসের ধারার বিচার। আজ বারবার মনে আসে এই কথাটাই। নীচ থেকে অনেকক্ষণ কেউ ছাদে আসেনি। ও, আজতো বাড়ীর অন্যরা সবাই গৃহপ্রবেশের নিমন্ত্রণে আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে। বেশীদূর নয় কাছেই। বিরাট আয়োজন করেছে। পূজোপাঠের ব্যাপার সকালেই মিটে গিয়েছিল। সন্ধ্যাবেলা খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন। আমারও যাওয়ার কথা ছিল। যাইনি। এড়িয়ে গিয়েছি শরীর খারাপের অজুহাতে। আসলে হাসপাতাল থেকে ফিরে আর সহ্য হচ্ছেনা মানুষের ভীড়। আলোর রোশনাই। হাসি-আনন্দের কোলাহল। হ্যাঁ, যেটা ভাবছিলাম। মেয়ে বড় হয়ে স্কুল পাশ করার পর নিলয় ওকে স্বরূপনগরের বাড়ীতে এনে রেখেছিল। ওকে ভর্তি করে দিয়েছিল কোলকাতার এক নামী কলেজে। আমি মাঝে মাঝে নিলয়ের মেয়েকে দেখতে যেতাম। যদিও বাড়ীতে আর সবাই আছে। দাদু-ঠাকুমা আর কাকারা সবাই আদরেই কাছে টেনেছিল মিতুনকে। তবুও একটা অভাব তো ছিলই। মা

এখানে থাকে না। সেই কোলকাতায়। বাবা বেশীর ভাগ দিনই হলদিয়ায়। দশবারো দিন অন্তর একবার বাড়ীতে আসে। সেদিক থেকে একটা বাৎসল্যের টান তো ছিলই আমার। এমনিতে বেশ ভালই চলছিল সবকিছু। তবে একটা ব্যাপার আমায় খুব পীড়া দিত। মিতুনের কিছু কিছু এ্যাটিচ্যুড। এত পসেসিভনেস। এত ডমিনেটিং টেণ্ডেনসি। আমি দেখতাম। সেদিন হয়ত নিলয় ফিরেছে হলদিয়া থেকে। আমরা বসে আছি ওদের সামনের বারান্দায়। অথবা ওদের খাবার টেবিলে জমে উঠেছে পারিবারিক আসর। যার অংশীদার আমিও। হঠাৎ মিতুন এসে ঢুকলো সেখানে। আলাপরত সবাইকে থামিয়ে দিয়ে এগিয়ে যেত বাবার কাছে। পকেট থেকে নির্বিধায় তুলে নিত পার্স। টাকা বের করে নিয়ে বলত, এটা আমি রাখলাম। নিলয় খুব মৃদুভাবে আপত্তি জানাত। —এটা কিছু লোকের পেমেন্টের টাকা। আমার অসুবিধা হবে। —কিছু হবে না। কাকে কাকে পেমেন্ট করবে বল। আমিই তাদের পেমেন্ট করে দেবো। আমি চুপ। মেশোমশাই আড়চোখে তাকালেন আমার দিকে। একনিমেষে পরিস্থিতি হয়ে উঠত অস্বস্তিকর। কিন্তু কোন কিছুর পরোয়া করত না মিতুন। পারিবারিক গুরুজনেরা রয়েছেন। তাদের সামনে এরকম আচরণ যে রুচিশোভন নয় এসব বিষয়ে ভ্রূক্ষেপই ছিল না ওর। পরে শুনেছি দাদুকেও বলত সে। তোমার বয়স হয়েছে। এখন থেকে সংসারের জমা-খরচের ব্যাপারটা আমার ওপরেই ছেড়ে দাও। আমি চালাব। এইসব আর কি! মেশোমশাই ক্ষুব্ধ হতেন। যদিও বলতেন না কিছু। হয়তো নিলয়ের কথা ভেবেই। বয়স হলেও তিনি অথর্ব হয়ে পড়েননি। যথেষ্ট শক্তসমর্থ ছিলেন। হেড অফ দি ফ্যামিলি হিসাবে সংসার এতদিন তিনিই চালিয়েছেন। এ প্রথার অন্যথা কোন সময়েই হয়নি নিলয়দের বাড়ীতে। আজ হঠাৎ এ ধরনের উপদ্রবে বিব্রত বোধ করতেন তিনি। আমার **চোখে** বিষয়টা খারাপ লাগলেও বিশেষ গুরুত্ব দিইনি শেষ পর্যন্ত। ভেবেছিলাম একেবারে অন্য জায়গা থেকে এসেছে। এখানে ওর বন্ধুবান্ধবও বলতে কেউ নেই। যার জন্যই এত গৃহমুখী মন। সংসারের সব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার এই প্রচেষ্টা। এটা হয়তো ঠিক হয়ে যাবে ভবিষ্যতে। আমাদের যাওয়া-আসা কথাবার্তা কিছুই যেন স্পর্শ করত না ওকে। শুধু একজনকে দেখলে খুশি হতো। অরিন্দম। নিলয়ের ভগ্নিপতি। কোলকাতায় কলেজে ভর্তি হবার সময় অনেক সাহায্য করেছিল মিতুনকে। বেসরকারী সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মী অরিন্দমকে পছন্দ করতাম আমরা

সবাই। খুব হাসিখুশি স্ফূর্তিবাজ ধরনের। নিলয়ের বাড়ীতে ওর যাতায়াত আগে থেকে তো ছিলই। মিতুন আসার পর বেড়েছিল। লেখাপড়ার ব্যাপারেও অরিন্দম গাইড করত মিতুনকে। এ উপলক্ষ্যে স্বরূপনগরে এসে রাতে থেকেও গিয়েছে কয়েকবার। আমি দেখতাম পিসেমশাই-এর সাথে খুব জমিয়ে গল্প করছে মিতুন। যুগপৎ খুশি ও নিশ্চিন্ত বোধ করতাম। অসম বয়সের এই বন্ধুত্ব মিতুনকে স্টাডির ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ওর বাবার অভাব পূরণ করতে নিজে থেকে এগিয়ে আসা অরিন্দমকে আমি ধন্যবাদ জানাতাম মনে মনে। এভাবেই চলছিল। বেশ কয়েকবার কোলকাতা থেকে অর্থাৎ কলেজ থেকে অরিন্দম মিতুনকে স্বরূপনগরে পৌঁছে দিয়েছে। বিশেষ আনন্দিত ছিল নিলয়। ভাবত কোলকাতার মত জায়গায়ও নিরাপদ ওর সন্তান। হাজার হোক নিজের লোকের দৃষ্টি সবসময় তো থাকছে তার ওপরে। কিন্তু না। দেখা গেল আমরা সকলেই বাস করছিলাম মূর্খের স্বর্গে। তাছাড়া আর কি বলে অভিহিত করা যায় একে। হঠাৎ একদিন উধাও দু'জন। মিতুন আর অরিন্দম। খোঁজ পাওয়া যায়নি তিন-চার দিন। আমরা সবাই খুঁজেছিলাম। চারদিনের মাথার ঊষা এসে উপস্থিত নিলয়ের কাছে। ওর একমাত্র বোন। অর্থাৎ অরিন্দমের স্ত্রী। অরিন্দমের টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা চিঠি পেয়েছিল সে। ঊষার উদ্দেশ্যেই লেখা। এ জীবনে ক্লান্ত বোধ করছে সে। তাই মিতুনকে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে চায়। ঊষা কাঁদতে কাঁদতে বলে, তোর মেয়ে আমার একি সর্বনাশ করল দাদা। আমি এখন কোথায় দাঁড়াব। স্তব্ধ হয়ে বসেছিল নিলয়। শুনেছিল বোনের সব অভিযোগ। তারপর বলেছিল, তুই দুঃখ করিসনা। ওরা যা ভাল বুঝেছে করেছে। আজ থেকে তোর ছেলের সব ভার আমার। বিধির একি পরিহাস কে জানে? পাপ করছে একজন আর জীবন দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করছে আরেক জন। বিজ্ঞজনেরা বলেন স্নেহ নিম্নগামী। মনে হয় যেটা বলেন না সেটা হল নিম্নগামী পাপও। যার ফলস্বরূপ আজ হাসপাতালের বেডে শুয়ে আমার বন্ধু। একি ভবিতব্য। না গত জন্মের কোন হিসাব এ জন্মে চুকাবার পালা, কে জানে?

(৭)

একে একে নিয়েছে বিদায় সবাই। শেষ হয়েছে খেদোক্তি আর সান্ত্বনা দেওয়ার পালা। শুধু আমি বসে আছি। নিশ্চুপ ভাবে। মাথায় আসে না কোন ভাবনা। কেমন যেন শূন্য হয়ে আছে চারিদিক। আজ ভোররাতে চলে গেছে নিলয়। সব মান-অভিমান, টানাপোড়েনের পালা চুকিয়ে সেখানে, যেখানে আর কিছু ছুঁতে পারে না কাউকে। যেটা শুধু ওয়ান ওয়ে ট্র্যাফিক। যাওয়া যায় কিন্তু ফিরে আসা যায় না। এ্যাকসিডেন্টের কিছুদিন পর পিজি থেকে ছেড়ে দিয়েছিল ওকে। আশা করেছিলাম এবার একেবারে সুস্থ হয়ে যাবে। শারীরিক উন্নতিও হচ্ছিল। কিন্তু দুর্ঘটনায় ড্যামেজ যাওয়া কিডনি আবার নতুন করে যন্ত্রণা দিতে শুরু করে। আবার হাসপাতাল। তিন-চার দিন পরে ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি। মাঝে আবার দেখতে যাওয়া হয়েছিল সবই। গতকাল দুপুরে ফোন করে ওর ভাই। নিলয়কে আজ সকালে ছেড়ে দেবে হাসপাতাল থেকে। খবরটা সুখের। শুনে আনন্দিত হয়েছিলাম যৎপরোনাস্তি। বলেছিলাম আমিও যাব। বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে আসবে সবাই মিলে। বাড়ীতেও জানাই সে কথা। সবাই আনন্দ পায়। মা বলেন, যাক্ এবার ওকে বাড়ী নিয়ে এস। কি যে কপাল ছেলেটার। এবার হয়তো হাঁফ ছাড়তে পারবে। আমি সব প্রস্তুতি সেরেছিলাম। অফিস ছুটি নিয়েছি। চেনাশোনা বন্ধুবান্ধবদের জানিয়েছি এই খবর। ঠিক করেছিলাম দু'বাড়ীর সবাই মিলে আয়োজন করব একটা গেট টুগেদারের । কিন্তু অলক্ষ্যে হিসাব তিনি অন্যরকম করেছিলেন। শেষ রাত আর ভোররাতের ঠিক মাঝে এসেছিল ফোনটা। নিলয়ের ভাই জানাচ্ছে। দাদা মারা গেছে। মাঝরাত থেকে অবস্থার হঠাৎ অবনতি ঘটতে থাকে। তারপর চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে সব চিকিৎসাবিজ্ঞানকে ফাঁকি দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেলে ও। যাক্ ভালই হলো। যে দুর্ভাগ্যের কালো ছায়া গ্রাস করছিল ওকে অবশেষে সরে গেল সেটা। বড় অভিমানে বড় দুঃখে চলে গেল সে। কোন নালিশ রাখেনি। কখনও অভিমান করেনি কারোর বিরুদ্ধে। কথায় বলে সত্যের জয় হয়। কষ্ট-দুঃখ চিরস্থায়ী হয় না কখনও কোন জীবনে। ব্যতিক্রমও আছে, তার প্রমাণ তো ওর সারাজীবন। গোলাপী অক্টোপাসের বলয় গ্রাস থেকে আর বেরোল না নিলয়। হ্যাঁ, পারল না বলাটা ভুল। দায়ভার থেকে মুক্ত করে সবাইকে 'শান্তি' দিয়ে গেল বলাই বোধহয় ঠিক।

প্রথমদিকে একেবারেই রাজী ছিল না প্রণয়। —কি হবে নন্দনদা যার জিনিস সেই রইল না। কি লাভ আর সেইসব টানাটানি করে। চোখ দুটো ছলছল করছিল ওর। আমারও গলার মধ্যে যেন আটকে একটা লোহার দলা। তবু জোর করে নামাই সেটাকে নিচের দিকে। বলি, কিন্তু প্রণয় এগুলোতো তার স্মৃতি। তার মূল্য তো তোমাদের কাছে প্রচুর। দেখ এক বছরে তোমার দাদার টাকা-পয়সাও খরচ হয়েছে জলের মতো। হলদিয়ার ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টে কিছু টাকা পয়সা আছে কিনা সেটাও তো দেখতে হবে। এমনি আরো কিছু কথাবার্তার পর অবশেষে রাজী হয়েছিল প্রণয়। ঠিক হয়েছিল ও যাবে হলদিয়ায়। নিলয়ের সেখানকার বাড়ীর আসবাবপত্রের একটা ব্যবস্থা করে আসবে। ওদের বাড়ীর সবাই সম্মতি দেয়। এর পরে আসে আরো একটা বড় চমক। প্রণয় ফেরে হলদিয়া থেকে। ওর কাছে জানা যায় সেখানকার বাড়ীর কিছুই নেই। বৌদি অর্থাৎ মিলি সব জিনিসপত্র একেবারে জলের দরে বিক্রি করে দিয়েছে স্থানীয় দোকানে। আর ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টটা ছিল জয়েন্ট। যেটার কথা কখনও বলেনি নিলয়। আইদার অর সারভাইভার এ্যাকাউন্টের সমস্ত টাকা তুলে নিয়ে চলে গেছে মিলি। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাদের নিয়মানুযায়ী কাজ করেছে। স্বামীর মৃত্যু ঘটলে আইনত এ ধরনের এ্যাকাউন্টের টাকা স্ত্রীরই প্রাপ্য। সবকথা শুনে আমি নিঃশব্দে ফিরতে থাকি বাড়ীর দিকে। অর্ধাঙ্গিনী শব্দটার এত 'সুন্দর' পরিণতিতে কোন বিশেষণই যোগ্য নয় বলে মনে হয়। পবিত্র বন্ধনের সাক্ষী অগ্নির এই চরম অবমাননা কারিণীর বিচার কোন আদালতে হবে তাই ভাবি। হয়তো নাও হতে পারে এই ধরনের 'মানুষ' বোধহয় সব বিচার বিবেচনার ঊর্দ্ধে। দোষগুণের তুল্যমূল্য বিচার না করে এ প্রশ্ন আমি রাখি সবার দিকে। যদি সঠিক সময় আসে তবে নিশ্চয়ই জানা যাবে ভবিষ্যতের গতি। জীবনদর্শন থেকে উঠে আসা বিশেষ ছবি কখনও বা সচকিত করে যায় আমাদের। তখনই উঠি চমকে। প্রর্থনা করি তার কাছে। এই মর্মান্তির ঘটনা যেন আর কারো না ঘটে। আর কেউ যেন হয় না এর শিকার।

নিলয়ের এনলার্জ করা ছবিটায় একটা বড় রজনীগন্ধার মালা যেন ক্রমাগত বিদ্রুপ করছিল আমাকে। ঘরে দেখতে পেয়েই আমার দিকে এগিয়ে এলেন মেসোমশাই। হাতে একটা খবরের কাগজ। কোন কথা না বলে প্রথম পাতাটা উল্টে একটা বিজ্ঞাপন দেখালেন আমাকে। মিলি জানাচ্ছে মিতুন ওর বাবার

পারলৌকিক কাজ করবে আলাদাভাবে কোলকাতায় মিলির বাড়ীতে। মেসোমশাই বললেন, তুমি কি ওখানে যাবে নন্দন? আমি বললাম প্রশ্ন উঠে না! আমি এখানেই এসেছি এখানেই থাকব। আর কোন কথা বললেন না মেসোমশাই। আমার হাতে একটা চাপ দিয়ে চলে গেলেন অন্যদিকে।

রক্তের দোষ নাকি পরম্পরায় ছড়ায়। অগ্নি সাক্ষীর এই ঘটনা আজও আমার স্মৃতির মধ্যে জ্বলছে। জানি না এ পুতুলখেলার শেষ কোথায়? হয়তো নেই কিম্বা আছে আরো পরে আরো দূর ভবিষ্যতে। আমার দৃষ্টি অতো প্রসারিত নয়। আমি শুধু এ স্মৃতি নদীর ধারেই বসে থাকতে চাই। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত...... অনন্ত কাল পর্যন্ত। পাইনি সমাধানসূত্র। হয়তো কোনক্ষণে কেউ খুঁজে পাবে।

সাক্ষী তুমি

(১)

মে মাসের শেষের দিকে শৈল শহরের আবহাওয়া মনোরম। শীতের অসহ্য কামড় নেই। আছে শুধু হালকা একটা পলেস্তারা। গায়ে শুধু একটা সোয়াটার চাপালেই হয়, দরকার লাগে না অন্য কোন ভারী শীতবস্ত্রের। রোদ ওঠার পর পাহাড়ের চূড়ায় ঠিকারে পড়া সূর্যকিরণ সোনা রং ধরতে থাকে। দার্জিলিং-এর মেজাজ কারোর সঙ্গে তুলনা করা যায় কিনা কে জানে? এই পরিবেশই আবার বদলে যাবে, বিলকুল পাল্টে যাবে জুন মাসে। শুরু হবে দিনভোর নাছোড়বান্দা বৃষ্টি। পাল্লা দিয়ে বাড়বে অসহ্য ঠাণ্ডা। হিমেল দাঁত ফোঁটাবে শরীরের একটু খোলা অংশ পেলেই। বাইরের সব আনন্দ মাটি। হোটেলের ঘরে বসে শুধু খাওয়া আর ঘুম। তা না হলে তাস বা চাইনিজ চেকার খেলা। একঘন্টা অন্তর চা বা কফি। যাক্‌গে। জুনে তো আমরা আর এখানে নেই। তখন তো কোলকাতায়। মনে হতেই মনটা খারাপ লাগতে থাকে পঙ্কজের। সবই আছে ওখানে। আনন্দ হাসিঠাট্টার প্রচুর সম্ভার। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে চুটিয়ে এনজয়মেন্ট। কিন্তু আরো আছে খারাপ লাগার ব্যাপারও। প্রতিদিন ধড়াচূড়া পরে রেডি হওয়া। সকাল সাড়ে নটার মধ্যে। দশটার মধ্যে অফিস চেম্বারে গিয়ে বসা। বাবার কড়া হুকুম। অফিসে প্রত্যেককে প্রখরভাবে ডিসিপ্লিন মেনটেন করতে হবে। অন্যথা হবার কোন উপায় নেই। পোশাক-আশাক কমদামী হলেও হওয়া চাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দু'বছর আগে বি. কম. পাশ করার পর থেকে নিয়মিতই বাবার অফিসে বসেছে পঙ্কজ। প্রথম প্রথম বেশ ভালই লাগত ওর। নতুন কাজ। এই কোম্পানীতে কোনরকম বসিং-এর ব্যাপার নেই ম্যানেজার থেকে একেবারে ক্লাস ফোরথ স্টাফ পর্যন্ত। প্রত্যেককে মিনিমাম সম্মান দিয়ে কথা বলতে হয়। প্রত্যেককেই আপনি বলে সম্বোধন করতে নির্দেশ দিয়েছেন মালিক বিশ্বনাথ থিরানী।

এ ব্যাপারটা অবশ্য ভালই লাগে পঙ্কজের। সব মিলিয়ে একটা ঘরোয়া পরিবেশ। কিন্তু মাঝে মাঝে বড্ড একা লাগে। সবকিছু ঘড়ির কাঁটা মেপে চলছে। একেবারে মসৃণ গতিতে। আচ্ছা, আমার রক্তে কি বোহেমিয়ানিজম বেশী আছে? মাস দু-তিন অন্তরই কেবল মনে হয় আর ভাল লাগছে না। এবার বেরিয়ে পড়ি। টানছে, ওরা টানছে আমায়। সমুদ্রের বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ছে ঢেউ-এর পর

ঢেউ। পাহাড়ী পথের বাঁকে দমকা হাওয়া আর তুষারের ঝাঁক বারবার এলোমেলো করে দিচ্ছে ভ্রমণবিলাসীদের চুলগুলোকে। একা আমিই শুধু এই বিচ্ছিরী শহরটায় অফিস আর বাড়ী করছি। মন আর চায় না মানতে। ব্যাগ গোছানোই থাকে। শুধু খবর দেওয়ার অপেক্ষা বন্ধুদের। তারপরেই আমরা চলে আসি বহুদূরে। ভীড়ে ঠাসা শহরটার দমবন্ধ করা ধূলো ধোঁয়াকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পাহাড় বা সাগর ঘেরা এখানে। বাঁধনছেঁড়ার ব্যাপারে আমাদের গ্রুপটা খুব তৎপর। শমিত, বাচ্চু, রণি, সৌভিককে নিয়ে আমাদের পঞ্চ পাণ্ডব। কেমন অদ্ভুত ব্যাপার। ওরা চারজনই কাজ করে। বেশ দায়িত্বের কাজ। তবু বছরে তিন-চারবার প্রায় মাসখানেকের ছুটি ম্যানেজ করে কিভাবে তা কে জানে? এবার আসার আগে তর্ক উঠেছিল তুমুল। রণির পছন্দ সমুদ্র। সৌভিক আর বাচ্চু জিদ ধরেছিল কাজিরাঙা বা করবেট ন্যাশনাল পার্ক। শমিত আবার মুসৌরী যাওয়ার জন্য পাগল। রীতিমতো চিৎকার আর তার থেকে গড়িয়েছিল টেবিল চাপড়াচাপড়ি অবধি। সবাই নিজের যুক্তিতে অটল। শেষ পর্যন্ত হাল ধরতে হয় পঙ্কজকেই। কাছাকাছি বয়স হলেও গোটা দলের ওপর একটা নেতৃত্ব আছে তার। অন্তত তার যুক্তিকে একেবারে ফেলে দেয় না বাকী সবাই। দার্জিলিং যাওয়ার প্রস্তাবে অবশ্য নিমরাজী ছিল সবাই। এতো একেবারে বেঙ্গলের মধ্যে। এত কাছে যেতে বলছিল! এখানে ঠিক ট্যুরের আমেজ কি আসে। বলেছিল শমিত। আমি বলতে চাই একটা অন্যকারণে। বলেছিল পঙ্কজ। ডাউহিলের বাড়ীটার চাবি তাহলে এখন নিয়ে নেওয়া যাবে। কেনার পর থেকে কাজের চাপে আর এখানে আসার সময় পায়নি বাবা। তাই আমাকেই নিয়ে নিতে বলল। নাহলে সামনেই বোর্ডের কোয়ার্টালি মিটিং। এসময় আউট অফ স্টেশন হলে বাবা খুব অসন্তুষ্ট হয়। কিন্তু এবার আর কেউ আপত্তি করেনি। আরো দু-চার কথার পর সবাই রাজী হয়ে গিয়েছিল। তাই আসার পথে কার্শিয়াং-এ একদিন থেকে চাবি নিয়ে রওনা দিয়েছিল দার্জিলিং-এর দিকে। বাড়ী দেখে খুশী সবাই। ছোটর মধ্যে বেশ সুন্দর। বিশ্রাম আর স্বাস্থ্যোদ্ধারের পথে একেবারে আদর্শ। এর মধ্যে একেবারে অন্যকথা বলেছিল রণি। বিয়ের পর এখানে হানিমুন করতে আফিস বুঝলি। সবাই বিস্মিত। এত জায়গা থাকতে হঠাৎ এখানে পঙ্কজের হানিমুনের জায়গা ঠিক করলি তুই! এটাতো একেবারে নির্জন। একসঙ্গে বলে উঠেছিল সবাই। আরে নির্জন বলেই তো বলছি। হানিমুন কি হাটেবাজারে হয়

নাকি। উড়িয়ে দিয়ে বলেছিল রণি। তাছাড়া পঙ্কজ আমাদের এ্যাডভেঞ্চারাস ছেলে। ও কেন সবার মত দেরাদুন বা কন্যাকুমারিকা যাবে! ওর ব্যাপারটায় একটা নতুনত্ব থাকলে তবেই জমবে, না? প্রশ্ন রাখে রণি। বাবা! তোর পেটে পেটে এত! বলে উঠে সৌভিক। তবে যে ব্যাটা ডায়লগ দাও যে কেমিষ্ট্রির কড়া কড়া ইকুয়েশন ছাড়া অন্যকিছু তোমার মাথায় ঢোকে না। এত দেখছি গভীর জলের মাছ। চড় তুলে রণির দিকে তেড়ে যাওয়ার ভান করে বাচ্চু । এমনি হাসিঠাট্টার মধ্যে দিয়ে শেষ হয় বিষয়টা। তার পরের দিন থেকে সবাই দার্জিলিং-এ। দিনচারেক হলো। কিন্তু গতকাল থেকে কেমন যেন মনখারাপ লাগছিল পঙ্কজের। পাশাপাশি দুটো বড় ঘর নিল ওরা হোটেলে। এখানে এলে এই হোটেলটা পছন্দ করে ও। ম্যানেজার, স্টাফ এমনকি বেয়ারাদের সঙ্গে বোঝাপড়া তৈরী হয়ে গেছে বারবার আসার ফলে। সবকিছুই ঠিক আছে। তা সত্ত্বেও গত রাত থেকে একেবারে বিমনা লাগছে পঙ্কজের। একসঙ্গে তাস বা জমাটি আড্ডার আসরও পানসে লাগতে শুরু করেছিল ওর। তাই সবার অলক্ষ্যে আজ সকাল হতেই বেরিয়ে পড়েছে পঙ্কজ। তিনজন ওঠেনি ঘুম থেকে। শুধু শমিত ইণ্ডিয়া টুডেতে গভীর ভাবে মগ্ন। ওর অবশ্য খুব সকালে ওঠা অভ্যেস। তা সে যত রাত্রেই ঘুমাক না কেন। একে আর ডাকেনি। হোটেলের বাইরে এসে অন্যমনস্ক পায়ে হাঁটতে শুরু করেছিল। তারপর কখন যে বসেছে রাস্তার পাশের এই পাথরটাতে তা খেয়াল নেই নিজেরই। এই রাস্তাটা অনেক নির্জন। ম্যালের সামনে দিয়ে যে পথটা উঠেছে অর্থাৎ সোজা ম্যালে উঠে গেছে সেখানে লোক সমাগম অনেক ঘুরে ম্যালের পিছনে গিয়ে নেমে গেছে সোজা নীচের দিকে। বসে থাকতে থাকতে বয়ে চলেছে সময়। স্রোতের মত । তার নিজস্ব গতি । এ গতির স্রোত উজানের না ভাটায় বোঝা যায় না তার কিছু। তবু ভাল লাগছে। আচ্ছা অনেকক্ষণ তো হয়ে এল। একা কেন বসে আছি এখানে? নিজের মনকেই প্রশ্ন করতে চায় পঙ্কজ। উত্তর নেই। উত্তর আসে না। এখানে, ঠিক এখানকার বাতাস কেমন একটা মহুয়ার গন্ধ। নেশা লেগে যায়। ঘোর যেন আরো বেশী ঘিরে আসে। এটা কিসের অনুভূতি। চিন্তা করতে চেষ্টা করে সে। হয় না। চিন্তার গতিপথ রুদ্ধদ্বারে আঘাত খেয়ে ফিরে আসে। কেউ বলে ওঠে, তুমি পাচ্ছ না, অনুভব করতে পারছ না আমার গন্ধ। বুঝতে পারছ না আমাকে। এইতো আমি। আছি তোমার পাশেই। রয়েছি তোমায় ঘিরে। দোহাই তোমার ছুঁয়োনা

আমায়। ধরতে এস না আমাকে। শুধু ভাব, ফিল কর আমাকে। আমি তো তোমারই রয়েছি। ছুঁলেই কিন্তু থাকবো না আর। আমার যে শরীর নেই। আছে শুধু একটা কুয়াশা। স্পর্শ করলেই ভেঙে যাব আমি। রেণু রেণু হয়ে মিলিয়ে যাব বাতাসে।

শুনছেন, এই যে শুনছেন। আচমকা কাঁধে একটা ঠেলা খেয়ে চমকে ওঠে পঙ্কজ। সামনে এক তরুণী। আচ্ছন্নের মত তাকিয়ে থাকে পঙ্কজ। আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে? ইতস্তত করতে থাকে পঙ্কজ। —না, মানে শরীর ঠিকই আছে। এখানে বসে থাকতে থাকতে কখন যে তন্দ্রা মতো এসে গেছে বুঝতে পারিনি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মেয়েটি। — আমি ম্যাল থেকে বাড়ীর পথে রোজ এখান দিয়ে শর্টকাট করি। কিন্তু কখনও কাউকে বসে থাকতে দেখিনি। তাই দেখে একটু অবাক হয়েছিলাম আর কি! ততক্ষণে উঠে পড়েছে পঙ্কজ। পূর্ণদৃষ্টিতে তাকায় তার দিকে। একুট লজ্জা পায় তরুণী। পঙ্কজও যেন একটা ঝটকা খায়। —আমার নাম রীতা। পঙ্কজ থিরানী। আপনি? —রীতা বিজলানী। সামান্য হেসে জবাব দেয়।

রাস্তার বাঁকের মুখ থেকে বিদায় নেয় রীতা। ওর চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে পঙ্কজ। একমনে ভাবতে থাকে এর কথা। রীতার চেহারাটা ভারী কমনীয়। সাজপোশাক একেবারেই এখনকার মত অর্থাৎ আধুনিক নয়। চোখেমুখে নেই কোন মেকআপ। কিন্তু চেহারার স্নিগ্ধতা মনকে ভারী প্রসন্ন করে। এর একটু লজ্জাশীলা ভঙ্গী আর ব্রীড়ানত ভাব দেখলেই মন যেন ভরে যায় প্রশান্তিতে। আরো ধুর! এসব কি ভাবছি! নিজের কাছেই নিজে লজ্জা পায় পঙ্কজ। মনকে শাসন করার চেষ্টা করে। পারে না যদিও। মাথা ঝাঁকায় ও । বারবার, বেশ কয়েকবার। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকে হোটেলের দিকে। কাউন্টারে টাঙান ঘড়িটার দিকে চোখ পড়তে অবাক লাগল। সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। এতক্ষণ ওখানে বসেছিলাম। অথচ উঠেছি সেই কোন ভোরে। ঘর তালাবন্ধ। বাহাদুর বলল, সাহেবরা সব বাতাসীয়া লুপ দেখতে গেছেন। আপনাকে অনেক খুঁজছিলেন। —ঠিক আছে । শোন, এক কাপ কফি আমার ঘরে পাঠিয়ে দিও। পঙ্কজ দরজার দিকে এগোতে থাকে। আবার পালটে গেছে চারিদিকের আবহাওয়া। সকালে ঘন্টাদুয়েক বেশ ঝলমলে রোদ ছিল। এখন আবার আকাশের মুখ ভারী। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে এত উঁচুতে মেঘ খেলা করে

বেড়াচ্ছে ঘরের চারপাশে। ঘরে ঢুকলেও বেশীক্ষণ বসেনি পঙ্কজ। পায়ে পায়ে বেরিয়ে এসেছে। বসেছে ডাইনিং রুমে। আস্তে আস্তে খাচ্ছে ব্রেকফার্স্ট। খবরের কাগজের পাতায় চোখ থাকলেও মন সেখানে নেই। সে এখানো বারবারই পালিয়ে যাচ্ছে ম্যালের পিছনের সেই পথে। নিজের মনে অস্বস্তি বোধ করে পঙ্কজ। এই ছটফটানীর মানে খুঁজে পায় না কোন। আচ্ছা, এর মধ্যে কি আর দেখা হবে না রীতার সাথে। চিন্তার জাল ছিঁড়ে যায়। ল্যাণ্ডরোভার সশব্দে এসে থামে হোটেলের দরজার সামনে। দ্রুতপথে নেমে আসে চারজন। — আচ্ছা ছেলে তো তুই। সকালে কাউকে কিছু না বলে কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলি। সৌভিকের গলায় বিস্ময়ের সুর। —আরে হঠাৎ সকালে উঠে মনে হলো একবার ম্যালের দিকে যাই। গিয়ে ঘুরতে ঘুরতে দেরী হয়েছিল। এসে শুনি তোরা চলে গিয়েছিস। অন্যান্য কথায় চাপা পড়ে যায় সে প্রসঙ্গ। তিনদিন হয়ে গেল এখানে। অথচ এখনও আণ্ডারগ্রাউণ্ড মার্কেটটা দেখা হয়নি। আজই যেতে হবে। বাচ্চু আর শমিতের উৎসাহই সবচেয়ে বেশী। টানাটানি করতে থাকে পঙ্কজকে। —নারে। এখন আর ইচ্ছে করছে না। সন্ধ্যার দিকে যাওয়া যাবে। এর মধ্যে সবাই এসে গিয়েছে নিজেদের ঘরে। ইতস্তত চলছে গল্পগুজব। কিন্তু ঠিক বাজছে না একসুরে। তাল কেটে যাচ্ছে বারবার। একসময় সবাইকে থামিয়ে দেয় রণি। —চুপ, সবাই চুপ। এই পঙ্কজ। তুই একটা গল্প বলতো। জোর করে পঙ্কজকে খাটে বসিয়ে দেয় রণি। —আমি কি বলবো। না না। গল্প আমি জানি না। এড়াবার চেষ্টা করে পঙ্কজ। —না বললে তো শুনবো না। কলেজে তো মেয়েদের ঝাঁক ঘিরে থাকত তোকে। —তা থাকলেও প্রেম তো হয়নি। বিলিভ মি। আমার কিন্তু একবারও মনে হয়নি এদের মধ্যে কাউকে ভাল লাগছে। খানিকটা অপ্রস্তুতের মত চুপ করে যায় রণি। —তার থেকে একটা কাজ করা যাক। আজ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে কারোর আগে কোন এ্যাফেয়ার হয়েছে কিনা আজ তার কথা শোনা যাক। প্রস্তাব রাখে পঙ্কজ। কিন্তু এতে সাড়া দেয়না কেউই। —আরে দূর। ওসব চাইল্ড এজের ব্যাপার। এই বয়সে সবারই তো দু-একটা কাফ লাভ হয়। এসব গল্প বারবার ভাল লাগে না। মানে বলার মতো নয় আর কি। শমিতকে সমর্থন করে সবাই। এবার মুখ খোলে সৌভিক। এই গ্রুপটার মধ্যে সৌভিক আর বাচ্চু বাঙালী। বাকি তিনজন অর্থাৎ পঙ্কজ থিরানী সিন্ধ্রী। রণি শ্রীবাস্তব উত্তরপ্রদেশের ছেলে। আর শমিত জয়সোয়াল রাজস্থানের।

যদিও এতদিন অর্থাৎ দু-তিন পুরুষ ধরে কোলকাতায় থাকার ফলে প্রত্যেকের মধ্যেই বেশ কিছুটা বাঙালীয়ানা বা বাঙালী কালচারের প্রভাব আছে। এদের মধ্যে ছাত্র হিসাবে সবচেয়ে ভাল সৌভিক ব্যানার্জী। তুলনামূলক সাহিত্য এম.এ.পাশ করেছে! এখন রিসার্চ করার যায় কিনা সে ব্যাপারে খোঁজখবর চালাচ্ছে। ওর পরিবারের প্রচুর হাই কানেকশন আছে। ভবিষ্যতে হয়তো পি.এইচ.ডি করতে বিদেশে যাবে। পঙ্কজ বলে, এ বিষয় সৌভিকের কথা আমি শুনতে চাই। কি রে! বল না। কাফ লাভের ব্যাপারে তোর একটা মতামত শোনা যাক। —কাফ লাভের বিষয়ে নতুন করে আর কি বলবো। বঙ্কিমচন্দ্র তো বহুদিন আগেই বলে গিয়েছেন। বাল্যপ্রেমে অভিশাপ আছে। —আচ্ছা! এখনকার সোসাইটিতে কি করলে কাফ লাভ হয় ? জিজ্ঞাসা শমিতের । —আমার মত যদি বলিস তো বলবো সোসাইটির এখন যা পজিশান তাতে সেও ভাবনাচিন্তাই একেবারে সেকেণ্ডারী হয়ে গেছে। ফিলিংসটা মরে যাচ্ছে মানুষের। এক্সশেপশন থাকলেও তার পার্সেন্টেজ খুব কম। কথাটা ছুঁয়ে যায় সকলকেই। ভাবনা চারিয়ে যায় সবার মাথায়। একটা চুপচাপ ভাব আসে ঘরের মধ্যে। ইতস্তত ভাব ঝেড়ে ফেলে পঙ্কজ। —আজ ম্যালের পিছনের রাস্তার একটা মেয়েকে দেখলাম, জানিস। —তা এখানকার রাস্তাঘাটে তো এখানকার মেয়েদের দেখা যাবেই। এতে আর নতুন কি আছে? জিজ্ঞাসা করে বাচ্চু। —নারে! এখানকার মেয়ে নয়। আমার সঙ্গে কথাও হলো। নাম বলেছে রীতা। রীতা বিজলানী। —মেয়েটাকে দেখতে কেমন? দারুণ সুন্দর। সুমিত বেশ আগ্রহের সঙ্গে ঝুঁকে আসে পঙ্কজের দিকে। না, না। খুব সুন্দর নয়। তবে এমন একটা কিছু আছে, যে দেখলেই খুব ভাল লাগে। একটা আলগা চটক। একটা অন্য কিছু। হই হই করে ওঠে বাকি সবাই। জানতে চায় রীতার কথা। পঙ্কজ আর কিছু বলার আগে বাহাদুর ঢোকে। ডিনার কি ঘরে দিয়ে যাবে, না, ডাইনিং রুমে গিয়ে খাওয়া হবে, তা জানতে চায়। প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে যায় মোটামুটি। খাওয়ার টেবিলে এ বিষয়ে আর কথা হয় না। ডাইনিং রুমে আজ ভীড় কম। বিকেলের পর থেকে ঠাণ্ডা খুব বেড়েছে। তাই বোধহয় বেশীর ভাগ বোর্ডারই নিজের ঘরে বসে ডিনার খেতে আগ্রহী।

এদিকে ফিরে যাবার দিন এসে গেল। আগামীকাল রওনা হওয়ার তারিখ। সন্ধ্যের পর ম্যালের দৃশ্য অপূর্ব। লোক সমাগম প্রচুর হয়। পাঁচ বন্ধু মিলে

বেরিয়েছে। টুকটাক সকলেই কিছু কেনাকাটা করছে। পরপর দোকানের মেলা। পঙ্কজ একটি বুটিকের দোকানের ঢুকে বুটিকের নানা ধরণের কাজ দেখছে। হঠাৎ ঐ দোকানেই দেখা রীতার সাথে। সঙ্গে রীতার বাবা-মা। রীতা বাবা-মার সাথে পঙ্কজের পরিচয় করিয়ে দেয়। পঙ্কজ এবং রীতার বাবা-মার সাথে নমস্কার বিনিময় চলে। সিন্ধি ভাষাতেই আলাপ বিনিময় হয়। প্রত্যেকে খুব খুশী। রীতারাও কালই দার্জিলিং মেলে রওনা হবে। রীতার বাবা-মা পঙ্কজকে তাদের কোলকাতার বাড়ীতে যেতে বলেন। পঙ্কজকে ঠিকানা এবং টেলিফোন নম্বর দেওয়া একখানা ভিজিটিং কার্ডও দেন। এর মধ্যে পঙ্কজের বন্ধুরা ঐ শো-রুমে উপস্থিত হয়। রাত্রের দিকে সময় ক্রমশ এগোতে থাকে যার যার হোটেলের দিকে রওনা হওয়ার মুখে। পঙ্কজ তার বন্ধুদের সাথে রীতা এবং রীতার বাবা-মায়ের পরিচয় করে দেয়।

হোটেলের ফিরে বন্ধুরা উদ্‌গ্রীব রীতার পরিচয় জানার জন্য। সৌভিক বলল, এ যে রাজঘোটক। শমিক বলে, যাক আমাদের মধ্যে একজনের তো ব্যবস্থা হলো। পঙ্কজ বলল, এ্যাতো সহজেই। বাচ্চু ও রনি একসাথে বলল, পঙ্কজের ওপর যার একবার নজর পড়বে তাকে ফিরানো মুস্কিল। এ্যাতো সুন্দর বর কোথায় পাবে? বাচ্চু তো পঙ্কজের প্রশংসায় আরও বেশী আগ্রহী। বলে, যেমন সুগঠন। যেমন সুন্দর মুখশ্রী তেমনই উচ্চতা এবং ফর্সা। এমন ছেলে কোথায় মিলবে। পরের দিন দার্জিলিং মেলে রওনা। ট্রেনে রীতাদের রিজার্ভেশন ব্যবস্থা আলাদা কম্পার্টমেন্ট। বন্ধুরা জোর করে একবার পঙ্কজকে দেখা করে আসতে বলল। দেখা হলো। ট্রেন তার সময়মতো চলতে শুরু করল, পরের দিন শিয়ালদহ ষ্টেশন। এবার সি অফ্-এর পালা। পঙ্কজ রীতাকে ইশারায় বলল— টেলিফোনে কথা হবে।

এরপর চলে যায় বেশ কিছুদিন। পঙ্কজের জীবনধারা বইতে থাকে তার নিজস্ব স্রোতেই। দার্জিলিং থেকে ফিরে আসার পর প্রথমে ফোনে এবং পরে রীতার সঙ্গে সাক্ষাত ও যোগাযোগ হয়েছে। ক্রমেই তা হয়ে গেছে নিগূঢ় থেকে নিগূঢ়তর। রীতা তার একেবারে কাছাকাছি এসেছে প্রাথমিক সব লজ্জা সংকোচের ব্যবধানকে কাটিয়ে। সে পেয়েছে তার প্রিয়তমকে। এমনই মনে ভাবে রীতা। কিন্তু এর মধ্যে পঙ্কজের জীবন যে একের পর এক নারীর আগমন ঘটে চলেছে,

তার সম্পর্কে আদৌ ওয়াকিবহাল নয় রীতা। অবশ্য তা সম্ভবও নয়। অনুরাগে অন্ধ তরুণী শুধু কল্পনা করে চলেছে এক সুখী ভবিষ্যত জীবনের! পঙ্কজের জীবনপত্রের রঙিন ও কালো পাতা কিভাবে খুলছে বা বন্ধ হচ্ছে তা সম্পর্কে জানার কোন সুযোগই নেই ওর।

পাঁচতারা হোটেল। রেস্তোঁরা হলটা সাজানো হয়েছে অপূর্ব সুন্দরভাবে। বিরাট একটা আলোর প্রজাপতির মধ্যে লেখা "রীতা ওয়েড্স পঙ্কজ"। বিয়েটা উভয়পক্ষের অভিভাবকদের মধ্যে কথাবার্তার পরেই ঠিক হয়েছিল। সেই উৎসবে মাতোয়ারা আজ সবাই। 'আজকের উৎসবের প্রধান আকর্ষণ তুমি, তাই না? বাঁ পাশে ফিসফিস করে বলে ওঠে রীতা।— সে কি! বিস্ময় প্রকাশ করে পঙ্কজ । ব্রাইড তো সব ম্যারেজেই মেইন এ্যাট্রাকশন। এমন নিম্নস্বরে কিছু কথাবার্তা আর খুনসটির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে সময়। গেষ্টদের খাওয়া-দাওয়া মিটতে মিটতে এখন রাত প্রায় গভীর। রীতা আর পঙ্কজ এখন শোবার ঘরে। ফুলসজ্জার আবেশে মাতোয়ারা দু'জনেই। এলোমোলো কথার মধ্যে এগোচ্ছিল দুটি প্রাণ মন পূর্ণতার দিকে । রীতা আজ একেবারেই অন্যরকম। অনেক—অনেক সপ্রতিভ। মনে মনে কিছুটা অবাক হচ্ছিল পঙ্কজ। সেদিনের সেই একান্ত লজ্জাশীলা তরুণী একেবারে পূর্ণ নারীতে রূপান্তরিত হলো কোন মন্ত্রে! সব মেয়ের ক্ষেত্রেই কি এ কথা প্রযোজ্য! ভাবে পঙ্কজ। কিন্তু কিছু বলতে পারে না রীতাকে। হঠাৎ পাশে রাখা ফোনটা বেজে ওঠে। বেশ বিরক্ত হয় দু'জনেই। এত রাতে কে ফোন করছে? সবাই তো জানে আজকের কথা। তবু অভ্যাসবশত। ফোনটা তোলে পঙ্কজ। রিসেপশান থেকে ভেসে ওঠে—স্যারি টু ডিসটারভ ইউ স্যার। বাট হিয়ার ইজ এন আর্জেন্ট কল। —হ্যালো। আই অ্যাম লিনাণ্ডী। তোমাকে উইস করছি পঙ্কজ। হ্যাপি নাইট বলে লাইনটা কেটে দেয়। রীতার জিজ্ঞাসা কার ফোন? পঙ্কজ বলে, না না! ওই আমার এক গার্ল ফ্রেণ্ডের। আবার রীতার জিজ্ঞাসা, তোমার কত গার্ল ফ্রেণ্ড।

পঙ্কজদের কোলকাতার বাড়ীতে বৈঠকখানা এখন জমজমাট। হানিমুন সেরে আজই দার্জিলিং থেকে ফিরছে পঙ্কজ আর রীতা। রীতা ব্যস্ত শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে। হানিমুনে কেনা জিনিষপত্র দেখাতে আর দার্জিলিং-এর অন্যান্য ঘটনা বলতে বলতে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত। এই উচ্ছ্বাসের শরিক পঙ্কজের বাড়ীর আর সবাইও। হাজার হোক পঙ্কজ তো বংশের একমাত্র ছেলে। তার নতুন সংসারযাত্রার

ব্যাপারে থিরানী পরিবারের খুশি স্বাভাবিক। এদিকে পঙ্কজের বাবা ফোনের ধারে কাছেও যেতে পারছেন না। সারাক্ষণ ফোন পঙ্কজের কাছে। থিরানী একটু বিরক্ত হন। ব্যবসা সংক্রান্ত নানারকম কথাবার্তা থাকে। এসময় টেলিফোন এনগেজড্ থাকলে খুব অসুবিধা হয়। আবার অন্য কথা ভেবে মনকে প্রবোধ দেন। ভাবেন, নতুন বিয়ে তো। স্বামী-স্ত্রীর মধুচন্দ্রিমার রেশ এখনও কাটেনি হয়তো। কাজেই এক্ষেত্রে মানিয়ে নেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। থিরানী ভাবেন প্রাথমিক ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি জানেন না এই ফোনালাপ পঙ্কজের দ্বিতীয় সংসারের। এ সংসারের সঙ্গিনী পঙ্কজের বন্ধু হিমাদ্রীর শালিকা লিনাগুী।

লিনাণ্ডী প্রায়ই কোলকাতায় আসে। এখানে এসে বেশ কিছুদিন দিদির বাড়ী থেকেও যায়। হিমাদ্রির একমাত্র শ্যালিকা তাই আদর যত্নও যথেষ্ট পায়। এই সুবাদে পঙ্কজের সাথে আরও কয়েকটি মেয়ের মতো লিনাণ্ডীর পরিচয়। লিনাণ্ডী কিন্তু ভালভাবেই জানতো রীতার সাথে পঙ্কজ যে প্রেমে আবদ্ধ আর তারই ফলশ্রুতি পঙ্কজ ও রীতার বিবাহ দেখতে দেখতে এক বছর অতিক্রান্ত। পঙ্কজ ও রীতার এক কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। মিঃ থিরাণী এবং মিসেস্ থিরাণী খুবই খুশী। তাঁদের আদরের নাতনী। দাদু ও ঠকুমার এখন থেকেই চিন্তা করেন তাঁদের নাতনীর জন্য ভবিষ্যতের সঞ্চয় সম্বন্ধে।

এদিকে আত্মীর পরিজন ও শুভানুধ্যায়ীর কাছ থেকে প্রচুর শুভেচ্ছাবার্তা আসতে থাকে। লিনাণ্ডীর পাঠানো শুভেচ্ছাবার্তাও বাদ যায়নি। কয়েকদিনের মাথায় একদিন রাত্রে বাড়ীতে লিনাণ্ডীর টেলিফোন। পঙ্কজ তখনও বাড়ীতে ফেরেনি। রীতা টেলিফোন ধরে। লিনাণ্ডী বলে, পঙ্কজকে বলো আমি দু-চারদিনের মধ্যে কোলকাতার দিদির বাড়ী যাচ্ছি। পঙ্কজ যেন আমার সাথে দিদির বাড়ীতে অতি অবশ্য দেখা করে। পঙ্কজ বাড়ী ফেরার পরে রীতা মেসেজটি জানাতে ভোলে না। পঙ্কজ এবং রীতার মেয়ের নামকরণ করা হয়েছে অনিতা। ডাক নাম অনি।

লিনাণ্ডি যথাসময়ে দিদির বাড়ীতে আসে। বেশ কিছুদিনের জন্য। আজকাল প্রায়ই পঙ্কজ বেশ দেরীতে রাত্রে বাড়ী ফেরে। অফিস থেকেও মাঝে মাঝে চলে যায় লিনাণ্ডীর সাথে দেখা করতে। দু'জনে দুপুরের লাঞ্চ সারে। তাই সেদিন পঙ্কজের

দুপুরের খাবার বাড়ী থেকে আর অফিসে আসে না। অনিতা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। লিনাণ্ডী কয়েকদিন থাকার পর আবার নিজের বাড়ী ব্যাঙ্গলোরে ফিরে যায়।

লিনাণ্ডীর চিঠি আসে অফিসের ঠিকানায় পঙ্কজকে লেখা। তোমার সাথে আমার পরিচয় নিশ্চয়ই রীতারও পূর্বে। আমার কিন্তু অনিতার উপর কোন রাগ বা ক্ষোভ নেই। আমি যথারীতি ওকে মানিয়ে নেব। শুধু কথা দাও তুমি আমার। পঙ্কজ ভাবে তা কি করে হয়? তার মনে দ্বিধা আসে। দু'জনের মধ্যে একটি তুলনামূলক ছবি ভেসে ওঠে। রীতা ঘরোয়া মেয়ে। ওকে নিয়ে কোন পার্টিতে যাওয়া যায় না। আর লিনাণ্ডী খুবই স্মার্ট। যে কোন পরিবেশে মানিয়ে চলার মত মেয়ে। দেখতেও সুন্দরী স্লীম ফিগার। এই সব দ্বন্দ্ব পঙ্কজকে মনের দিকে খুবই বিব্রত করে তোলে। আবার ভাবে, আমার তো একটি মেয়েও হয়েছে। তবে কেন লিনাণ্ডী আমাকে পেতে চায়? এটা কি ভালবাসা, প্রেম না স্নেহ কিছুই মাথায় আসে না।

হঠাৎই একদিন অফিসে লিনাণ্ডীর জরুরী ফোন। কি হয়েছে কেউ জানে না। পঙ্কজ বাড়ীতে ফোন করে বলল আজই সন্ধ্যার ফ্লাইটে তাকে বাইরে যেতে হচ্ছে। রীতা জিজ্ঞাসা করে ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে না অন্য কিছু। পঙ্কজ বলল, পরে বলব আগে ঘুরে আসি। সোজা অফিস হতে চলে যায় এয়ারপোর্টে। ব্যাঙ্গালোর পৌঁছবার পর পঙ্কজ দেখে লিনাণ্ডীর চোখে মুখে কি রকম বেসামাল ভাব। পরের দিন লিনাণ্ডীর বাবা-মা পঙ্কজের অনেক কথা আলাপের পর তারা সব মিলিয়ে ওখানকার এক মন্দিরে নিয়ে যায়। পঙ্কজ দেখে বিবাহের জন্য পুরোহিত এবং নিয়মাচারের সমাবেশ। পঙ্কজ এবং লিনাণ্ডীর মালা বদলের সাক্ষী রইল পুরোহিত, লিনাণ্ডীর বাবা-মা আর গাড়ীর ড্রাইভার।

এতক্ষণ যে কাহিনীটি বললাম তার সাময়িক যবনিকা ওঠে আরো বহুদিন পরে। দুই কেন্দ্রীয় চরিত্রকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। অভূতপূর্ব এক বিশেষত্ব আমি দেখেছি এ কাহিনীর নায়িকার মধ্যে। শাশ্বত ভারতীয় নারীর সুষমা তার মধ্যে বিদ্যমান। তার মূল্যবোধ ভাবিয়ে ছিল আমাকে। তার একনিষ্ঠতা দেখে আমি মনে মনে শ্রদ্ধা করেছিলাম তাকে। স্বামীসঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চিত হয়েও তার প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা তার কমেনি এতটুকুও। বিশেষত একথা যখন পরিষ্কার যে স্বামী অন্য আরেক নারীর প্রতি আসক্ত। দ্বিতীয় জনের সঙ্গে সে ঘরও বেঁধে ফেলেছে। দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ের ফলাফল হিসাবে সন্তান-সন্ততিও

হয়ে গেছে। তাদের নিয়ে সম্পূর্ণভাবে সুখী সে। প্রথম স্ত্রীর কোন খোঁজও রাখেনি কখনও। রীতা কিন্তু বিশ্বাস করে অন্য কথা। সে ভাবে তার স্বামী একদিন নিশ্চয়ই ফিরে আসবে তার কাছে। শেষ হবে তার শর্বরীর প্রতীক্ষা। মহাকালের ঘড়িতে এক একটা ঘন্টা বাজে। চলে যেতে থাকে এক একটা বছর। ছয় ঋতুর খেলা কখনও বা মনে দোলা দিয়ে চলে যায় তার হঠাৎ কোন বসন্তের মদালতায় আবার কখনোবা সঘন বর্ষায়। কেউ উপহাস করে। কেউ চায় বুঝিয়ে বলতে। এরকম প্রতিজ্ঞার কোন মানে হয় না। মানে হয়না এভাবে জীবনটা নষ্ট করার। তুমি অন্য একটা বিয়ে করে আবার নতুন ভাবে জীবন শুরু কর। উপদেশ অভিযোগ বা অনুযোগ কোনটাকেই আমল দেয় না রীতা। যদিও তার জীবনে 'উষা' এখনও আসেনি। আদৌ কখনও আসবে কিনা ঠিক নেই তারও। আমাদের দেশের নারীর আত্মত্যাগের কাহিনী যুগে যুগে বর্ণনা করা হয়েছে। আত্মত্যাগের মহিমা কবির কলমে, দার্শনিকের স্বীকৃতিতে দিনে দিনে হয়েছে প্রোজ্জ্বল। কিন্তু প্রকৃত মূল্য কি পেয়েছে সে? আমার ধারণা পায়নি। মিথ্যা স্তোক বাক্য দিয়ে ভুলিয়ে রাখা হয়েছে তাকে।

(২)

রীতার নিজের কথায় ছোটবেলার পরিচয়ে আসা যাক— আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে খুব ভালবাসত। ছোটবেলা থেকেই আমার আচার-আচরণ অন্য ছেলেমেয়ের মতো ছিল না। বাচ্ছারা যেমন দামাল হয়, যেমন হয় উচ্ছল— আমার মধ্যে সেই উচ্ছলতা বা দুরন্তপনার লেশমাত্র ছিল না। আমি ছিলাম একেবারে ধীর স্থির। মা বলতেন, আমার গুড্ডি একেবারে লছমী মাই। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরেও সবাই বলত, এই মেয়েটাকে এক জায়গায় বসিয়ে রাখলে সেখানেই বসে থাকে। নড়েও না। সমবয়সীরা যখন লুকোচুরি বা দৌড়াদৌড়ি করে খেলা করত তখন আমি পুতুল খেলতাম। আমার বন্ধুরা আমাকে ডাকত। ওদের সাথে খেলার জন্য টানাটানি করত। আমি যেতাম। কিছুক্ষণ খেলতাম। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। কেমন যেন লাগত। ভাল লাগত না মোটেই। একসময় ঠিক পালিয়ে আসতাম। আস্তে আস্তে এসে দাঁড়াতাম পুজোর ঘরে। আমার নানী সকালে তিন চার ঘন্টা এ ঘরে কাটাতেন। বালগোপালের ছবির সামনে চোখবুজে বসে থাকা নানীকে দেখতে এত ভাল লাগত। ধূপধুনোর গন্ধে পরিপূর্ণ জায়গাটা। তার মাঝে নানী একদম সাধীকার মত বসে আছেন। আমিও নিঃশব্দ পায়ে এসে চুপ করে বসতাম তাঁর পিছনে। আমাদের ঠাকুঘরের জানালাগুলো বড় বড় ছিল। জানালার চওড়া ধাপীতে পোষা বিড়ালটা চুপ করে বসে থাকত। একেবারে দুধসাদা রং-এর বিড়াল। গায়ে একটা অন্য দাগ পর্যন্ত নেই। বাবা ওকে পছন্দ করতেন না। কিন্তু নানীর জন্য কিছু বলার উপায়ও ছিল না। অবশ্য ওর স্বভাবটাও ছিল ভাল। চুরি করে খাওয়ার অভ্যাস ছিল না একেবারেই। যা হোক, পুজোর ঘরে আমিও বসে থাকতাম। রোজ প্রায় ঘন্টাখানেক তো বটেই। আমার কল্পনায় আসত কত কিছু। কেউ কেউ বিরক্ত হতো। ভাবত এইটুকু মেয়ের এত পাকা পাকা আচরণ কিসের। মাও রেগে যেতেন এক এক সময়। বাবা কিছু বলতেন না। বলা যায় বলার বা দেখার সময় ছিল না তাঁর। ব্যস্ত ব্যবসায়ী মানুষ। ব্যবসার কাজে সারা দেশে ঘুরে বেড়াতে হতো তাঁকে। তবু তার মধ্যে যে ক'টা দিন বাড়ী থাকতেন একেবারে আঁকড়ে রাখতেন আমাকে। লাডলী— পেয়ারী বেটি। একেবারে ছোট্ট বয়স থেকেই আমি আচরণ করতাম একেবারে পাকা গিন্নীর মত। বাবা অফিস থেকে ফিরে এলেই সঙ্গে সঙ্গে প্রায় শরবতের গ্লাস নিয়ে হাজির হতাম আমি। তাঁর পায়ের

জুতো খুলে নিয়ে র‍্যাকে রেখে আসতাম। তারপর বাবা যখন চোখ বুজে বিশ্রাম নিতেন আমি নীরবে এসে আরাম কেদারার পিছনে। বাবার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতাম। একটা ভীষণ কমনীয় মাধুর্যে ভরে থাকত আমার বাবার মুখ। একসময় বলতেন, তোর মনে এত দয়া। প্রাণে এত মায়া মমতা। তোর জন্যে আমার মাঝে মাঝে বড় চিন্তা হয়। কিসের চিন্তা ভেবে পেতাম না আমি। পঙ্কজকে প্রথম দেখেই আমার মনটা মায়ায় ভরে গিয়েছিল। চোখ দুটো কি সুন্দর! এত সপ্নিল। এত গভীর। সঙ্গে একটা কি সুন্দর বিষণ্নতা। এটা অবশ্য আমার নিজস্ব ধারণা ছিল। মা বলতেন এমনকি আমার বন্ধুবান্ধবরাও বলত, সব কিছুর মধ্যে একটা দুঃখ খুঁজে বের করা তোর বাতিক। একথাটা প্রায়ই উঠত। আমি দুঃখ দেখতাম। আবার দেখে সহ্য করতে পারতাম না একটুকুও রাস্তায় কুকুর বা বিড়ালের বাচ্ছা মরে পড়ে থাকলে আমি কেঁদে ভাসাতাম। সে কান্না বন্ধ হতো না বাড়ীতে এসেও। সবচেয়ে দুঃখ পেতাম কোনো পাখী বা পাখীর বাচ্ছা মরে থাকতে দেখলে। যাক, যা বলছিলাম। পঙ্কজকে প্রথম দেখার পর আমার মনে হয়েছিল ওর কাছে বসি। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে আদর করি। প্রেমিকার মত নয়। স্ত্রীর মত। মায়ের মত। মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা বলেন, প্রত্যেক পুরুষ স্ত্রীর মধ্যে কখনও খোঁজে মাকে আবার কখনও বোনকে খোঁজে। তেমনি বিপরীত ভাবে প্রত্যেক নারীও প্রিয় পুরুষের মধ্যে তার বাবা, বন্ধু, এমনকি এক ধর্ষককেও নাকি খুঁজে পেতে চায়। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই প্রতিটি মেয়ের মধ্যে প্রেম সংক্রান্ত ধারণা আসে। আমার সমবয়সী বান্ধবীরাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। ক্লাস সেভেন এইট থেকেই ওরা বয়ফ্রেণ্ড বাছতো। তাদের ক্যাডবেরী দেওয়া, তাদের কাছ থেকে আইসক্রীম খাওয়া এসব চলতো ভালমেতোই। দুঃসাহসী দু-একজন চিঠিপত্রের আদান-প্রদানও করত। এমনকি মাঝে মাঝে স্কুল পালিয়ে সিনেমা যাওয়া, এসবও চালাত কেউ কেউ। এগুলোর প্রস্তাব আমার কাছেও আসত। আমার কিন্তু ভাল লাগত না এতটুকু। দু-একটা চিঠি যখনই পেয়েছি — ছিঁড়ে ফেলেছি তখনই।

(৩)

মিঃ থিরানীর একটি বাগান আছে সিমলায়। হঠাৎ পঙ্কজের আব্দার ঐ বাগান বাড়ী মেরামতি করে দিতে। সে সিমলায় একটি হোলসেল মার্কেটের ব্যবসা করবে।

পঙ্কজের ধরনধারণে ইদানিং থিরানী দম্পতির কিছুটা সন্দেহ হচ্ছে। কলকাতা তার পছন্দ নয়। পঙ্কজের মোহ নতুন ব্যবসা তৈরী করা। আধুনিক যুগে তার বাবার ব্যবসার কোন প্রসপেক্ট নেই। খুবই প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা। তাই সে সিমলা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকা নিয়ে একটি হোলসেল বাজার তৈয়ারী করবে। সেইজন্য তার সিমলায় থাকা দরকার। ইতিমধ্যে পঙ্কজের নতুন সংসারের কথাও আর কারো অজানা নেই।

খুবই দুঃখ পেয়েছেন মিঃ এবং মিসেস থিরানী। কি ভাবে আত্মীয় স্বজনকে এর কৈফিয়ত দেবেন। বেচারী রীতার ভবিষ্যৎ কি? অনিতারই বা কি হবে? শ্বশুর শাশুড়ীর একমাত্র চিন্তা রীতা যেন মানসিকভাবে ভেঙ্গে না পড়ে। অনিতাকে তো দেখতে হবে। ওকে পড়াশুনা করাতে হবে। সুপাত্রে বিবাহ দিতে হবে। এসব নিয়ে ভাবনা চিন্তার অন্ত নেই।

পঙ্কজ মাঝে মধ্যে কোলকাতায় আসে। বাবার অফিসেও যায় এবং কিছু কিছু কাজ দেখাশুনাও করে। মিঃ থিরানী ছেলেকে খুব একটা ভাল চোখে দেখেন না। বাবা ও ছেলের মধ্যে মায়ের ভূমিকাই অগ্রনী। মিসেস থিরানী মিঃ থিরানীকে নানাভাবে বুঝবার চেষ্টা করে যাতে দু'জনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আসে। মিঃ থিরানী ছেলেকে বুঝবার চেষ্টা করেন। যেভাবে হোক লিনাণ্ডীকে ছাড়তে হবে, এমনকি টাকা পয়সার বিনিময় হলেও। থিরানী ছেলেকে এও বলেন যে, তার আশ্রয়ের বা বাড়ীতে লিনাণ্ডীর কোন স্থান নেই। কিন্তু প্রেমে আসক্ত লিনাণ্ডী কখনও পঙ্কজকে ছাড়বে না। সে তো পাকাপোক্তভাবে পঙ্কজকে নিয়ে ঘর বেঁধে ফেলেছে। দু'জনে মিলে সিমলাতেই একটা ব্যবসার পরিকল্পনাও করে ফেলেছে। পঙ্কজ-এর জন্য তার মার মাধ্যমে মিঃ থিরানীর কাছ থেকে কিছু টাকাও সংগ্রহ করে ফেলেছে।

দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে। পঙ্কজ সিমলাতে একটি বিদেশী কোম্পানির তৈরী শার্টের পাইকারী ব্যবসা করবার জন্য এজেন্সি নেয়। চলছেও মোটামুটি। মিঃ থিরানী তার বৌমা এবং নাতনীর জন্য কিছু কিছু সঞ্চয়ের ব্যবস্থা শুরু করে।

শেয়ার, কোম্পানি ফিক্সড্ ডিপোজিট এবং ব্যাঙ্ক সেভিংস এ্যাকাউন্ট। অন্যদিকে মিসেস থিরানী রীতাকে নিয়ে কোলকাতা বা অন্য রাজ্যে যেখানে যেখানে বিভিন্ন ধরনের পোষাকের প্রদর্শনী বা মেলা হচ্ছে তাতে যোগ দিচ্ছেন। দু'জনেই এই ফ্লোটিং কোম্পানির অংশীদার। প্রদর্শনীর বেচা-কেনার পর অংশীদারদের লাভ-ক্ষতির হিসাব করাটাও একটি রীতি হিসাবে এদের মধ্যে পরিগণিত হতো। মিসেস থিরানী বলতেন রীতা যেন সঙ্গহীন একাকীত্ব অনুভব না করে তার জন্যই এই ব্যবসা। ব্যস্ততার মধ্যে থাকলে ওর মানসিক চাপ থাকবে না। অনিতা একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াশুনা করছে। পড়াশুনাতেও ভাল। স্মার্ট মেয়ে। সব সময় জলি। দাদু ঠাকুমার প্রিয় পাত্রী। ঠাকুমা যেখানে যাবে অনিতাকেও সাথে যেতে হবে। ঠাকুমার প্রাণ এই অনিতা।

পঙ্কজ এখন লিনাণ্ডীর দুই সন্তানের জনক। দুই ছেলেই দেখতে খুব সুশ্রী। দু'জনেই যেন বাপ কা বেটা। রীতা তার মনকে কিছুতেই বেঁধে রাখতে পারছে না। রীতার দুই কাকা থাকে জার্মানীতে। তারা এবং অন্য ভাই বোনরা রীতাকে পরামর্শ দিয়েছিল আইনি ব্যবস্থা নিতে। কিন্তু রীতার মনে সায় নেই। ছি ছি! স্বামীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা। তা মোটেই সম্ভব নয়। যাকে এত ভালবেসেছিলাম তার কোন দোষ থাকতে পারে না। যত দোষ লিনাণ্ডীর। বিদেশে থেকে দাদারা এসেছেন। বোনের ব্যাপারে তারা মিঃ এবং মিসেস থিরানীর সাথে দেখা করেন। রীতার দাদাদের বুঝিয়ে বলেন, আমরাও এতে খুব দুঃখিত। রীতা আমাদের ঘরের বৌ। তার প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার আমাদের বরদাস্তের বাইরে। দাদাদের অনুরোধে বোনকে তাদের সাথে নিয়ে যাবার অনুমতি মেলে এবং ঠিক হয় যে রীতা ওদের ওখানে দুই মাস থাকবে। এতে রীতা হয়তো কিছুটা অস্বস্তির থেকে রেহাই পাবে!

পঙ্কজ এখন প্রায়ই কোলকাতা আসে। নানরকম নতুন নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা নিয়ে। তাতে কত টাকা খাটালে কত লাভ হবে সবই মিঃ থিরানীকে বোঝাবার চেষ্টা করে। পঙ্কজ তো তাঁরই ছেলে। মিঃ থিরানীর এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে আর্থিক অনটনের জন্য পঙ্কজ আজ তার বাবাকে এসব বোঝাচ্ছে। কিন্তু মিঃ থিরানী স্ত্রীর আব্দারে ছেলেকে টাকা দিতে বাধ্য হন। মিসেস থিরানীর বক্তব্য পঙ্কজ তাদেরই ছেলে। একটা ভুল করে ফেলেছে। পঙ্কজের দুই ছেলে তাদেরই তো নাতি।

কারণ মিসেস থিরানীর কিন্তু মনের দুর্বলতা লিনাণ্ডী ও তার দুই ছেলের প্রতি ক্রমশই ঘনীভূত হচ্ছে। পঙ্কজ কিন্তু একবার মিসেস থিরানীকে বলেও ছিল ওদের নিয়ে একবার কোলকাতার বাড়ীতে আসবে কিন্তু ওর মা মিঃ থিরানীকে না জিজ্ঞাসা করে মত দিতে পারে নি।

কিছুদিন পরে পঙ্কজ কোলকাতায় তার শালীর বাড়ীতে লিনাণ্ডী এবং দুই ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে এসেছে। ফোনে তার মাকে জানায় তাদের আগমনের সংবাদ। মিসেস পঙ্কজকে পরের দিন লাঞ্চের সময় আসতে বলেন। মিঃ থিরানীও থাকবেন তাই এই বাড়ীতে তাদের নিয়ে আসার জন্য একটা ব্যবস্থা হতে পারে। পরের দিন যথাসময় পঙ্কজ উপস্থিত। লাঞ্চের টেবিলে মিসেস থিরানী মিঃ থিরানীকে জানালো যে পঙ্কজ সকলকে নিয়ে কোলকাতায় এসেছে। শুনে মিঃ থিরানীকে রাজী করালেন যাতে পরের দিন পঙ্কজ সবাইকে নিয়ে বাড়ীতে আসে। ছেলে এবং মা উভয়েই খুব খুশী। পরের দিন মিঃ থিরানী অফিসে গেলেন না। শত হলেও ছেলের "নতুন বউ" এবং এই বংশের দুই নাতি আজ প্রথম এই বাড়ীতে আসছে।

লিনাণ্ডী সুন্দরী। স্মার্ট বধূ। রীতি-নীতি সবই তার জানা। শ্বশুর শাশুড়িকে কিভাবে পোষ মানাতে হবে সবই যেন তার নখদর্পণে। সেবা শুশ্রুষার কোন ত্রুটি নেই। লিনাণ্ডী জানে ভালবাসা দিলে তবেই ভালবাসা পাওয়া যায়। অনিতা— সে যে তার স্বামীরই মেয়ে। তার উপর তো লিনাণ্ডীর কোন বিদ্বেষ বা ক্ষোভ থাকার কথা নয়। লিনাণ্ডী এও জানে অনিতাকে তার নিজের মেয়ের মত করে স্নেহ ভালবাসা দিতে হবে। তবেই তো সে আমার হবে। আমার বাধ্য হবে। মিসেস থিরানী যে অনিতাকে ভালবাসা দিয়ে এত বড় করেছে। আমাকেও মিঃ এবং মিসেস থিরানীকে দেখাতে হবে যে তোমাদের থেকে অনিতার প্রতি আমার ভালবাসা কোন অংশে কম নয়।

লিনাণ্ডী মনে মনে ভাবে আজ যে দরজা দিয়ে শ্বশুরবাড়ীতে প্রবেশ সেই দরজাকে চিরদিন অবারিত দ্বার করে তুলতে হবে। রীতা এই বাড়ীতে আর কত দিন? এই বাড়ীতেই আমার জায়গাই আসল। কারণ পঙ্কজের সাথে আমার পরিচয় রীতারও আগে। এবার লিনাণ্ডী অনিতাকে নিয়ে সকালে বিকালে পড়াতে বসে। অনিতার পড়াশুনার মান লিনাণ্ডীর ঠিক পছন্দ নয়। ব্যাঙ্গালোরের স্ট্যাণ্ডার্ড-এর থেকে অনেক উঁচু মানের। নিজেকে সঠিক ভাবে গড়ে তুলতে

অনিতার জন্য চাই আরো সুন্দর পরিবেশ আর সঠিক মানের শিক্ষাগত যোগ্যতা। তাই লিনাগুীর ইচ্ছা এবার অনিতাকে নিয়ে যাওয়া এবং একটি ভাল স্কুলে ভর্তি করানো। এই সব কথা সে পঙ্কজকে বলে। পঙ্কজ এই সব কথা বলে তার বাবা মাকে। পঙ্কজের মেয়ে। তার ভাল মন্দ বিচারের ক্ষেত্রে দাদু-ঠাকুমারও ভূমিকা আছে। এ প্রস্তাবে মিঃ থিরানী এবং মিসেস থিবানীর থেকে কোন বাধা আসে না। রাত্রে সকলে বসে ঠিক করা হয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টি. সি.-র ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে ভর্তি হলে হলে সরকারী একটি সার্টিফিকেটেরও প্রয়োজন। সবই করা হবে।

পরের দিন রীতার ফোন আসে সেই সুদূর জার্মানী থেকে। মিসেস থিরানী লাইনটা ধরে। মিসেস এবং মিঃ থিরানী ফোনে অনেকক্ষণ কথা বলে। অনিতার সাথেও কথা হয়। মিসেস থিরানী আবার অনিতার থেকে ফোনের লাইনটা নিয়ে কথা বলতে বলতে এও বলে যে অনিতাকে পঙ্কজ নিয়ে যেতে চায়। কারণ আরো ভাল স্কুলে পড়াশুনা করবার জন্য। তার যাবতীয় ব্যবস্থা করা হচ্ছে। লিনাগুী এবং দুই ছেলের কথা চেপে যাওয়া হয়। মেয়ে ভাল স্কুলে পড়াশুনা করবে তাতে রীতার আপত্তি থাকবে কেন? রীতা তো শুনে খুব খুশী। এতক্ষণ লিনাগুী কথাগুলো সব শুনছিল। আর মনে মনে ভাবছিল রীতার মতের জন্য কে তোয়াক্কা করে? এদিকে পঙ্কজের যাওয়ার দিন এগিয়ে আসে। মেয়ের ভর্তিব জন্য এবং ব্যবস্থায় কিছু উন্নতি পরিকল্পনা নিয়ে সে বাবার কাছ থেকে কিছু টাকাও নিয়ে যাচ্ছে। ব্যাঙ্গালোর পৌছেই পঙ্কজ মেয়েকে স্কুলে ভর্তির জন্য খুব ছোটাছুটি করছে। শেষ পর্যন্ত এক ক্লাস নিচুতেই ওকে ভর্তি করতে হলো। কারণ অনিতার যে ক্লাসে ভর্তি হওয়ার কথা তাতে সিট নেই। মেয়েদের এই স্কুলটি পুরোপুরি আবাসিক। সুন্দর পরিবেশ। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ নিরামিষ। পদ্ধতিমত সব কিছু ব্যবস্থা। পড়াশুনা ছাড়াও যার যেদিকে আগ্রহ যেমন—নাটক, নাচ, বাজনা. আবৃত্তি, আঁকা, গান ইত্যাদি তাকে সেইভাবে চর্চা করানোর পদ্ধতিও রয়েছে। সপ্তাহে একদিন অর্থাৎ রবিবার বাড়ীর লোকদের সাথে তিন মিনিট পর্যন্ত ফোনে কথা বলতে পারবে।

জার্মানীতে বসে রীতা খবর পায় তার বাবা খুব অসুস্থ। তাড়াতাড়ি সে কোলকাতায় চলে আসে। মিঃ থিরানী রীতার হঠাৎ আগমনে কিছুটা বিচলিত হয়। পরে সব শুনে আশ্বস্ত হয়। সেদিনই দুপুরের খাবার পর রীতা যায় তার

বাপের বাড়ী। বাবার অসুস্থতার জন্য রীতা দিনের বেলায় বাপের বাড়ী থাকে আর রাত্রে শ্বশুর বাড়ী আসে। বেশ কিছুদিন এইভাবে চলার পর রীতার বাবা আবার গুরুতর অসুখে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। দিন শুধু গোনা হচ্ছে। বাড়ীতে রীতার মা। এই অবস্থায় রীতা তার শ্বশুর শ্বাশুড়িকে বলে কয়েকদিন বাবার কাছে থাকার জন্য চলে যায়।

পঙ্কজও জানে রীতার বাবা খুব অসুস্থ। পঙ্কজ হঠাৎ করেই একদিন তার বাড়ীতে এসে উপস্থিত। পরের দিন সে রীতার আলমারি খোলে। রীতার যাবতীয় কাপড় এবং অন্যান্য জিনিসপত্র প্যাকেট করে রীতার কাছে পাঠিয়ে দেয়। রীতা ওই প্যাকেটগুলো দেখে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে, এতে কি আছে? কেনই বা এগুলো নিয়ে এলে? ড্রাইভার উত্তর দেয়, ছোটবাবু পাঠিয়ে দিয়েছে। রীতা জিজ্ঞাসা করে, ছোটবাবু এসেছে নাকি? কবে এলো? ড্রাইভার জানায় কাল রাত্রিতে এসেছে। বাবা-মা পঙ্কজকে জিজ্ঞাসা করে রীতার এই জিনিসগুলো পাঠিয়ে দেবার উদ্দেশ্য কি! পঙ্কজের জবাব রীতাকে আর এই বাড়ীতে ঢুকতে দেবে না। ওর সাথে এই বাড়ীর সম্পর্ক শেষ।

রীতা বুঝতে পারে সে এখন খুবই অসহায়। সে আজ সম্বলহীন। তার দুই চোখে জল। না থাক, নিজেকে প্রবোধ দেয়। বাবা শয্যাশায়ী, মাকে কিছু বললে মা খুব দুঃখ পাবে। রীতার মা অবশ্য আড়াল থেকে সব লক্ষ্য করছে। ভাবে আমার রীতার কপালে এতই দুঃখ ছিল। রাতে দাদারা ফোন করে তাদের বাবার খবর জানতে চায়। তখন রীতা পঙ্কজের কথা সব বলে। দাদারা তাকে সান্ত্বনা দেয় আর বলে, আমাদের না জানিয়ে যেন কোন কাগজে বা ডকুমেন্টে সই করিস না। দাদারা এও জানায় যে তারা যত শীঘ্র সম্ভব এখানে আসছে।

(৪)

অনিতা স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর প্রথমদিকে তার মায়ের সাথে দু-একবার ফোনে কথা হয়েছে। ইদানিং তাও বন্ধ। তার স্কুল পারফরমেন্স খুব ভাল। বাৎসরিক পরীক্ষায় রেজাল্টও খুব ভাল। রেজাল্টের জেরক্স কপি লিনাণ্ডী তার শ্বশুর শাশুড়িকে পাঠায়। মিঃ এবং মিসেস খুব খুশী। কনগ্র্যাচুলেশন পাঠায়। এদিকে অনেকদিন হলো মিঃ এবং মিসেস থিরানী অনিতাকে দেখেননি। দু'জনের মন খুব খারাপ। লিনাণ্ডী ফোন করে মিঃ এবং মিসেস থিরানীকে। বলে, অনিতা তোমাদের দেখার জন্য প্রায় কান্নাকাটি করে। ভাবছি স্কুল ছুটি পড়লে অনিতাকে নিয়ে আমরা সবাই তোমাদের কাছে আসব। আমার মনও তোমাদের জন্য ছটফট করে। কতদিন তোমাদের দেখি না। তোমরাই তো আমার বাবা এবং মা। আমার বাবা-মাকে হারাবার পর আমার একমাত্র অবলম্বন তোমরা। তোমাদের দিকে তাকিয়েই আমার বাঁচা। তোমরাও তো আমাকে তোমাদের সত্যিকারের ছেলের বৌ বলে মেনে নিয়েছ। সেই ভাবেই আমি তোমাদের কাছ থেকে স্নেহ ভালবাসা পেয়ে এসেছি। মনে হয় এখনই ছুটে গিয়ে তোমাদের একবার দেখ আসি। মিঃ এবং মিসেস থিরানীও লিনাণ্ডীর মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েন।

সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না। দুই মেরুতে বসে আছে দু'জন। এক মেরুতে অবস্থান করছে রীতা। সে জানে না ভাগ্যের পরিহাসে কি হতে চলেছে। রীতার শুধু আশা যে সে সন্তোষী মার পূজো করে। পঙ্কজ একদিন নিশ্চয়ই তার কাছে ফিরে আসবে। ইতিমধ্যে রীতার বাবা গত হয়েছে। ভাইরা রীতাকে বলে জিভোর্স স্যুট ফাইল করতে। রীতা যেন ডিভোর্সের পর তার জীবনটাকে একটি সঠিক পথে নিতে পারে। মিঃ থিরানী ও ওর ভাইদের তাই পরমর্শ দেয়। এদিকে পঙ্কজ নিজে ডিভোর্স স্যুট ফাইল করবে না। সে বহুজনের কাছ থেকে আইনি পরামর্শ নিয়েছে। খুবই জটিল এই আইন। বিশেষতঃ পঙ্কজের ক্ষেত্রে এই আইন জটিলতম।

অন্য মেরুতে অবস্থানকারী লিনাণ্ডী। সেও জানে পঙ্কজের ক্ষেত্রে ডিভোর্স স্যুট ফাইল একটি বে-আইনি পদক্ষেপ।

রীতা এখন পুরোপুরি একা। এই জন্য ভাইরা রীতার জন্য একটি কাজও ঠিক করে। একটি বনেদী পাড়ায় কাপড়ের শো-রুম দেখাশোনার। গাড়ী করে সে বাড়ী থেকে শো-রুমে আসে। আবার শো-রুম থেকে গাড়ী করে বাড়ী যায়।

কখনও কখনও মালিক পক্ষ কাপড়ের নানারকম ডিজাইন দেখার জন্য বিভিন্ন পাইকারী কাপড়ের শো-রুম ভিজিট করতে রীতাকে বলে। আবার কখনও ম্যানেজার বা সহকারী ম্যানেজারকেও উহার সাথে পাঠায়।

অনিতার স্কুলে ছুটি পড়ে গেছে। লিনাঙ্গী অনিতা ও তার দুই ছেলেকে নিয়ে একদিন শ্বশুর বাড়ীতে উপস্থিত হয়। লিনাঙ্গীর এই শহরে আছে মাসীর বাড়ী নিজের বড় বোনের বাড়ীও আছে। শ্বশুর বাড়ী থেকে মাঝে মাঝে দেখা করার জন্য মাসীর বাড়ী বা বোনের বাড়ীও যায়।

একদিন লিনাঙ্গী হঠাৎ শ্বশুর বাড়ী এসে শ্বাশুরীকে বলে, আজই রীতাকে দেখলাম, গাড়ীতে ওর সাথে একজন ভদ্রলোক যাচ্ছিল। বেশ সন্দেহের সুরে ও এও বলতে বাকি রাখে না যে লিনাঙ্গীর বোন এবং ভগ্নিপতির চোখে এই দৃশ্য প্রায়ই ধরা পড়েছে।

পঙ্কজ ব্যাঙ্গালোর থেকে ওদের নিয়ে আসে। রীতার প্রসঙ্গ তুলে লিনাঙ্গী রীতার চরিত্র হননের জন্য যাবতীয় কথা পঙ্কজকে বলে। সাক্ষী করে দিদি এবং দিদির স্বামীকে। দিদির স্বামী বলেন, আমরা পঙ্কজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পঙ্কজও মাকে এই প্রসঙ্গ তুলে বলে, তোমরা এই চরিত্রহীনা রীতার সাথে কোন সম্পর্ক রাখতে পারবে না। অনিতাও যাতে কোন যোগাযোগ না রাখে তারই ব্যবস্থা করছি। ছোট্ট অনিতাকেও মাম্মীকে ফোন করতে বারণ করে। অনিতা অনিচ্ছার সুরে জিজ্ঞাসা করে, মাম্মীকে কেন ফোন করতে নিষেধ করছো। লিনাঙ্গীর জবাব, তুমি এখন ছোট। কথার অবাধ্য একদম হবে না। বাপি যা বলছে শোন। বড় হলে বুঝতে পারবে। অনিতা কিন্তু এই সবের মানে কিছুই বুঝতে পারে না। সে ভাইয়ের সাথে খেলতে শুরু করে। এদিকে লিনাঙ্গীদের যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এল। আর মাত্র দুদিন বাকী। যাওয়ার আগের দিন রাত্রে অনিতা একবার বলে, কাল তো আমরা চলে যাচ্ছি। মাম্মীকে একবার ফোন করবো। লিনাঙ্গী রেগে যায়। বলে, না কোন প্রয়োজন নেই। এদিকে রীতা মেয়ের ফোন না পেয়ে হতাশ হয়ে শুয়ে পড়ে কিন্তু সারা রাত্রি ঘুম আসে না। কি হলো? অনিতার শরীর খারাপ হলো না তো? কেনই বা ফোন করেনি? সকাল হতে অনিতা এদিকে ওদিক তাকিয়ে খালি ঘর থেকে মাম্মীকে ফোন করে বলে—আজই আমরা যাচ্ছি। মাম্মী কি হয়েছে? তোমাকে কেন ফোন করতে দিচ্ছে না। এই মাম্মী আর পাপা খুব তোমার উপর রাগ করেছে। রীতা বলে, অনি! তুমি ওসব কথা মোটেই

ভাববে না। ভাল করে পড়াশুনা করবে। জীবনটাকে সুন্দর করে তুলবে। আচ্ছা মাম্মী বলতো! কে আমার মাম্মী তুমি না এই মাম্মী। সে পরে হবে—বাই। অনিতাও বলে—বাই। টেলিফোনের লাইন রেখে দেয়। অনিতা ঘর থেকে বেরিয়েই সোজা চলে যায় মিসেস থিরানীর কাছে। চুপিসারে কানে কানে বলে, দাদী মাম্মীর সাথে এখনই টেলিফোনে কথা বললাম। খবরদার পাপা এবং মাম্মী যেন টের না পায়। খুব রেগে যাবে। মিসেস থিরানীও চান না যাওয়ার দিন একটা চেঁচামেচি হোক। তাই তিনি বলে—অনি! যাও হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নাও।

ব্যাঙ্গালোরের উদ্দেশ্যে পঙ্কজ তার পরিবার নিয়ে রওনা হয়ে গিয়েছে। ফ্লাইট সময়মত গিয়ে পৌঁছাল। রাত্রে পৌঁছ সংবাদ এসে গিয়েছে। অনিতা ফোনে মিঃ এবং মিসেস থিরানীর সাথে কথা বলেছে। বাদ রইল শুধু মাম্মীর সাথে কথা বলা। এটা তো নিষেধ। এতদিন মাম্মীর কাছ থেকে স্নেহ ভালবাসা সে যে অনেক পেয়ে এসেছে। আজ তবে কেন এত বাধা, মন তার সায় দেয় না। এতো নকল মা। তবু মাম্মী তাকে বলেছে এই মার কথা শুনবে। পড়াশুনা ঠিক ভাবে করবে।

এদিকে রীতা ঠিক করেছে সে নিজেই একটা ব্যবসা করবে। নিজের ফ্ল্যাটের কাছে একতলায় রীতার ভাইরা একটি ফ্ল্যাট রেখেছিল। ভবিষ্যতে কিছু ব্যবসা-পত্র করার জন্য। সেটি খালি পড়ে আছে। ভাইরা এখানে এসেছে। তাহাদের সাথে কথাবার্তা চলছে।

আগেই বলা হয়েছিল। মিঃ থিরানী রীতা এবং অনিতার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য কোম্পানীর কিছু ফিক্সড্ ডিপোজিট সার্টিফিকেট এবং অনেক শেয়াব কিনে রেখেছিল। তার মধ্যে অনেকগুলো ফিক্সড্ ডিপোডিট সার্টিফিকেট-এর টাকা পাবার সময় হয়ে গেছে। অনিতার ম্যাচিওরড সার্টিফিকেটে তার মা রীতার সই দরকার। মিঃ থিরানী ঐ সার্টিফিকেটগুলি রীতার কাছে পাঠায় এবং বাহককে বলে দেয় রীতা যেন ওগুলো সই করে সাথে সাথে ফেরৎ দেয়, কারণ অনেকগুলো তো ম্যাচিওরড হয়ে গেছে। রীতা বাহককে বলে এতগুলো সার্টিফিকেট সই করতে সময় লাগবে। কাল যেন এসে নিয়ে যায়। পরের দিন মিঃ থিরানী লোক পাঠায় ঐ সার্টিফিকেটগুলোকে নিয়ে আসতে। রীতা ঐ লোকটিকে বলে, কালই রাত্রে ফোনে দাদা ঐ কাগজগুলো দেখতে চেয়েছে এবং দাদা বলেছে তাকে না জানিয়ে যেন রীতা কোন সই না করে। কাজেই সে যেন

পরে আসে। এখন সার্টিফিকেটগুলোর ব্যাপারে কোন খবর নেই। এদিকে রীতা তার বাড়ীর নিচে বেশ বড় আকারে ডিপার্টমেণ্টাল শো-রুম খুলেছে। মনোহারী জিনিষ থেকে পোষাক পরিচ্ছদ কি নেই ঐ শো-রুমে! বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে। লিনাক্ষী এবং পঙ্কজ তার ছেলেদের নিয়ে প্রায়ই ব্যাঙ্গালোর থেকে কোলকাতায় আসে মিঃ এবং মিসের থিরানীর বাড়ীতে। অনিতাও এখন উঁচু ক্লাসের পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত। কথায় কথায় মিঃ থিরানী পঙ্কজকে রীতাকে দেওয়া ফিক্সড ডিপোজিট সার্টিফিকেটগুলোর কথা বলে। শুনে পঙ্কজ মিঃ থিরানীর উপর খুবই অসন্তুষ্ট, বলে, কেন তুমি রীতাকে আমাকে না জানিয়ে সার্টিফিকেটগুলো দিলে? পঙ্কজ তারই এক বন্ধু মিঃ টনির সাথে দেখা করে। রীতা টনির পরিবারকে খুব জানে। মিঃ থিরানীর কাছে ব্যাঙ্কের আরও কিছু সার্টিফিকেট ছিল যা কিনা ম্যাচুরিটির পর্যায়। পঙ্কজ টনির হাতে ঐ সার্টিফিকেটগুলো দিয়ে বলে এইগুলো রীতার কাছ থেকে সই করাবে এবং বলবে আগেরগুলো সব যেন তোমাকে দিয়ে দেয়। সব মিলিয়ে মূল্য কম করে চৌদ্দ লাখ টাকা। পঙ্কজ টনিকে একথাও বলে যে, তোমাকে রীতা খুব ভালভাবেই জানে। কাজেই আশা করি তোমার হাতে ও সব দিয়ে দেবে। টনি তবুও দ্বিধাগ্রস্থ। কাগজগুলো নিয়ে সে পরের দিনই রীতার বাড়ী যায়। রীতা টনিকে দেখে খুব খুশী। দু'জনের মধ্যে কুশল বিনিময় হয়। টনির স্ত্রীর সম্বন্ধেও রীতা জিজ্ঞাসাবাদ করে। রীতার চোখ মুখ দেখে টনি খুব আশান্বিত। ভাবে সে যে কাজের জন্য এসেছে তা খুব সহজেই হয়ে যাবে। এদিকে রীতার চোখ মুখ ছলছলে। সে গভীর প্রত্যাশা নিয়ে আছে। হয়তো পঙ্কজ টনিকে পাঠানো মানে খুবই একটা সুখকর। কারণ রীতা যে প্রতি শুক্রবার সন্তোষী মায়ের পূজা করে থাকে। আজ তো শুক্রবার। টনিকে চা এবং মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করে। টনি রীতাকে চা খাবার জন্য অনুরোধ করলে রীতা টনিকে শুক্রবারের কথা মনে করিয়ে দেয়। চা খেতে খেতে টনি বলে, রীতা এই কাগজগুলো মিঃ থিরানীর কাছে পড়ে ছিল। সবই অনিতার নামে। তোমার সই হলে এগুলো ক্যাশ করে মিঃ থিরানী বলেছেন তোমাকে দিতে। এগুলো তো ব্যাঙ্কের মাধ্যমে আসবে। তাই ব্যাঙ্কের চেকেও তোমার সই থাকা দরকার। রীতা একদম বাধ্য মেয়ের মত সব সার্টিফিকেটে এবং চেক বইগুলিতে সই করে দেয়। যেন মরিচিকার মত ছুটছে সে। আর ভাবছে এবার বোধহয় সে দুর্গম পথ অনেকটা অতিক্রম করতে

পেরেছে। কৃতকার্য টনি এবার রীতাকে জিজ্ঞাসা করে—মিঃ থিরানীর পূর্বের সার্টিফিকেটগুলোর কথা।

ঐগুলো তো আমার দাদাদের কথামতো ঠিকানা পাল্টিয়ে কিছু কিছু ভাঙ্গানো হয়ে গেছে। টনি বলে, তা কি করে হয়। মিঃ থিরানী শুনলে কি ভাববে জানি না। হ্যাঁ, আমি তো ওগুলো অনিতার নামে ব্যাঙ্কে একাউণ্টে রেখে দিয়েছি। ভবিষ্যতে ঐগুলো তো ওর জন্যই আমি খরচ করবো।

রীতা টনিকে বাড়ীর নিচেই তার নিজস্ব ব্যবসা দেখাতে নিয়ে যায়। সব সময়েই কাষ্টোমার রয়েছে। বেশ কিছু টাকা খরচ করেই এই ব্যবসা সে করছে। এই ব্যবসা দেখভাল করার জন্য রয়েছে একজন ম্যানেজার আর ছয়জন কর্মচারী। ম্যানেজার মিঃ থিরানী—মাঝারী বয়স, স্মার্ট সুন্দর চেহারা। রীতা টনির সাথে মিঃ থিরানীর পরিচয় করিয়ে দেয়। সেদিনই টনি যায় মিঃ থিরানীর বাড়ীতে। পঙ্কজও সেখানে উপস্থিত। সই করা কাগজপত্র টনির কাছেই রাখতে বলে। ম্যাচুরিটি চেকগুলো যথারীতি ব্যাঙ্কে জমা পড়ার জন্য ইনষ্ট্রাকশান্ দেওয়া হয়। টনি রীতাকে বলেছিল, এই টাকাগুলোর কিছুটা অংশ তো তোমার প্রাপ্য নিশ্চয়ই থাকবে। পঙ্কজ পরের দিনই রওনা হয়ে যায় ব্যাঙ্গালোরে। তার চিন্তা রীতার কাছে তো পূর্বের ফিক্সড ডিপোজিটের প্রায় চৌদ্দ লাখ টাকা পড়ে আছে। গিয়েই রীতাকে ফোন করে বলে, তুমি অতি অবশ্য আমার নামে দশ লাখ টাকার একটি ড্রাফট পাঠাবে। কারণ তুমি বাবার পাঠানো ফিক্সড ডিপোজিট ভাঙ্গিয়েছ। রীতা বলে, ওগুলো সবই অনিতার নামে রাখা হয়েছে। পঙ্কজ বলে তা জানি না, আমার টাকা দরকার এখনি পাঠাবে অন্যথায় তোমার সাথে আমার এবং অনিতার যোগাযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে। এটা কিন্তু জেনে রেখো।

বেশ কয়েকদিন পরে টনি শেয়ার ট্রান্সফারের কতকগুলি ফর্ম নিয়ে যায় রীতার কাছে অর্থাৎ রীতার নামে যে বেশ কিছু শেয়ার আছে মিঃ থিরানী তা বিক্রি করতে চান। টনির কথামতো রীতা তাতেও সই করে। কারণ রীতা জানে তার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য সে অনেক টাকা পেতে চলেছে। কিন্তু কোথায় সে টাকা। রীতা ভাইদের জানায়। তারা তো চটে লাল। তাদের না জানিয়ে রীতা কেন ঐ সব কাগজে সই করতে গেল? এদিকে শেয়ার কোম্পানীর কাছ থেকে চিঠি আসতে শুরু করেছে রীতার সই যথার্থ সই কিনা! রীতা তাতে জানতে পারে শেয়ারগুলো মিঃ টনির স্ত্রীর নামে ট্রান্সফার করা হচ্ছে। রীতা যথারীতি

আপত্তি জানায়। এদিকে ফিক্সড ডিপোজিটের টাকা এক পয়সা তার কাছে আসছে না। রীতা ব্যাঙ্কে গিয়ে জানতে পারে টাকাগুলো যথারীতি তোলা হয়েছে। ভাইদের এই বিষয় বিশদভাবে জানাবার পর তাদের কথামত রীতা ব্যাঙ্কে তার সইগুলো পরিবর্তন করে এবং চেক বইগুলো মিসপ্লেসড বলে সে নতুন চেক বই নেয়।

তার মনে ক্রমশঃ দুঃখ এবং ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছে। অনিতা তার সাথে কোন যোগাযোগ রাখছে না। লিনাণ্ডী এবং তার আত্মীয়-স্বজন রীতার চরিত্রগত দোষ খুঁজে বেড়াচ্ছে। রীতার শরীরও মাঝে মাঝে খারাপ হচ্ছে। প্রেসার, সুগার এবং আর্থারাইটিসে সে আক্রান্ত। শহরের ভিতর গাড়ীতে সাথে কাউকে দেখলে কিংবা ডাক্তারের কাছে বা ব্যবসার জন্য কোথায় গেলেও সবই বিষ নজরে দেখা হয়। শুধু তাই নয় পরিকল্পনামাফিক তা মিঃ এবং মিসেস থিরানীর কাছে নালিশ করা হয়, অনিতাকেও রীতা সম্পর্কে মন বিষিয়ে দেওয়া, এ সবই চলছে। এর কিছু কিছু আভাস রীতার কানেও যাচ্ছে। কিন্তু রীতার কিই বা করবার আছে! শুধু মুখ বুজে সহ্য করা। ভবিষ্যৎ শুধু অনিতা। তাও আজ বেশ কিছুদিন হলো যোগাযোগ পুরো বিচ্ছিন্ন। অনিতারই বা কি করার আছে। তাকে যে ফোনও করতে দেওয়া হচ্ছে না। তাকে নানাভাবে আটকে রাখবার চেষ্টা হচ্ছে। দাদাজী এবং দিদাজীর বাড়ীতে এলেও তাকে রীতার সাথে যোগাযোগ থেকে নানাভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হচ্ছে।

পঙ্কজ ও লিনাণ্ডীর দুই ছেলে আর পঙ্কজ ও রীতার এক মেয়ে অনিতা। লিনাণ্ডী কিন্তু সবার কাছে অনিতাকে নিজের মেয়ে বলেই পরিচয় দেয়। বলে, আমার এক মেয়ে এবং দু'ছেলে। তিন জনেই এক সাথে থাকা এবং চলাফেরা করে। পড়াশুনাতেও তিন জনই খুব ভাল। অনিতা উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে এবার কলেজে ভর্তি হয়েছে। বিষয় বিজ্ঞান, এছাড়াও ওর ঝোঁক বেশী আঁকা এবং ইংরাজী সাহিত্যের উপর। লিনাণ্ডী এর ভিতর একদিন মিঃ এবং মিসেস্ থিরানীর সামনেই অনিতার বিয়ের প্রসঙ্গে তোলে। তা শুনে অনিতা খুব রেগে যায়। এখনই কি! গ্র্যাজুয়েট হতে দাও। দাদাজি এবং দিদাজি বলে, আচ্ছা তাই হবে। তবে এখন থেকে তো খোঁজখবর করতে হবে। তাই না? শুনে একগাল হেসে অনিতা সেখান থেকে চলে যায়। এদিকে রীতা তার ভাইদের বলে

অনিতার জন্য এখন থেকে একটা ভাল পাত্র দেখতে। ভাইয়েরা রীতাকে জিজ্ঞাসা করে এদেশে না বিদেশে। রীতার উত্তর, যেখানে তোমাদের পছন্দ। রীতার কথার মধ্যে একটা কিন্তু কিন্তু ভাব। সে বলেই ফেলে, কি হবে জানি না। সন্দিগ্ধ মন নিয়েই রীতা ভাইদের এগোতে বললো।

অনিতা গ্র্যাজুয়েট হতে চলেছে। আগের মত অত ছট্‌ফট্‌ ভাব কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। এখন প্রায়ই একটা বিষণ্নতার ভাব। খুব পরিষ্কার করে কিছু একটা বলে না। লিনাণ্ডী একদিন ব্যাঙ্গালোরে বসেই মিঃ থিরানী এবং মিসেস থিরানীকে বলে—অনিতা কেমন যেন একটু বিষণ্নভাব নিয়ে চলাফেরা করছে। আগের মত সেই উন্মাদনা ওর ভিতর দেখছি না। কথা বললেও ঠিক সেই ভাবে সাড়া দেয় না। তাই একদিন দিদাজী অনিতাকে জিজ্ঞাসা করে, অনিতা তোমার শরীর ঠিক আছে তো? কেন দিদাজী! আই অ্যাম ফাইন। তবে কি জান? মাঝে মাঝে কোলকাতায় মার জন্য মন কিরকম করে? তাকে রাত্রে স্বপ্ন দেখি। লিনাণ্ডী শুনে বলে সে কি? তোমাকে না বলেছি কখনও ও সব চিন্তা করো না। আমিই তো তোমার মা। তোমাকে পড়িয়েছি এরপর আমার কর্তব্য তোমাকে সুপাত্রে ধরে দেওয়া।

এবার আসুন আমরা দেখি তিন সংসারের তিনরকম চরিত্র। এরা কে কিভাবে তাদের জীবন অতিবাহিত করছে। কি এদের ভবিষ্যৎ? জানি না পরিণতি সম্বন্ধে পাঠকরা কি ভাবছেন? মিলনান্ত? না বিয়োগান্ত? তাই তো ভবিষ্যতের চিন্তা—এদিকে রীতা আশায় আছে পঙ্কজ একদিন তার কাছে আবার ফিরে আসবে। কারণ সে যে সন্তোষীমার পূজারিণী। নিয়মনিষ্ঠা সহকারে সে পূজাপাঠ করে যাচ্ছে।

পঙ্কজ—তার আয় সে রকম থাকলেও সে যে ঘোর সংসারী, রীতা সম্বন্ধে তার চিন্তার অবকাশ কোথায়? লিনাণ্ডী তো তার সব সময়ের সঙ্গিনী।

অনিতা— সে তো এখন তার 'মা' রীতার উপর খুব ক্ষুব্ধ। সে তার দিদাজীর মুখ থেকে শুনতে পায় বেশ কিছু সোনার অলঙ্কার, আনুমানিক মূল্য প্রায় দশ লক্ষ টাকা, অনিতার বিবাহ দেওয়ার জন্য রীতার নামে ব্যাঙ্কের লকারে রেখে দিয়েছিল। পরে দিদাজী ওই গুলি রীতার কাছ থেকে চাইতে গেলে সবটা দেয় না। মাত্র কুড়ি-বাইশ হাজার টাকার অলঙ্কার তুলে দেয়। এসবই মিসেস থিরানীর (দিদাজী) বক্তব্যের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ আনার চেষ্টা।

৫

এবার আসা যাক বর্তমান পরিস্থিতিতে তিন বাড়ীর কি অবস্থা দাঁড়াচ্ছে—

ব্যাঙ্গালোর—পঙ্কজ, লিনাণ্ডী, অনিতা, দীপায়ন এবং বৈশ্যায়ন এই পাঁচজনের সংসার। পঙ্কজকে লিনাণ্ডী কোন মতেই চোখের আড়াল করতে চায় না। কারণ অনিতা যখন এই সংসারে আছে। অনেক কিছুই মানিয়ে চলতে হবে। খুব চতুর মহিলা। দীপায়ন ও বৈশ্যায়ন স্কুলে পড়াশুনা করছে। পড়াশুনাতে দিদি অনিতা ওদের দুই ভাইকে সাহায্য করে। দিদি আর কয়েকমাসের মধ্যেই স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় বসবে। বিষয় বিজ্ঞান। পরবর্তী পর্যায়ে ইচ্ছা স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় পাশ করার পর কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে।

কোলকাতা—রীতা তার ব্যবসাকে সুন্দরভাবে সাজাতে বদ্ধপরিকর। পাশের একখানা ঘর বিক্রি হবে। তাদের সাথে যোগাযোগ চলছে। দর কষাকষি চলছে। এটা পেলে সে তার ব্যবসা আরও বাড়াতে পারে। এদিকে শরীরও খুব ঠিক নেই। হাই প্রেসার, ব্লাড সুগার এবং আরথারাইটিস নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। ডাক্তার দেখানো এবং ঔষধপত্র চলছে। মানসিক চিন্তার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তার সব সময় ব্যবসা নিয়ে উন্নতির চিন্তাভাবনা। এও ঠিক চিন্তার ভিতর রয়েছে অনিতার বিবাহে যৌতুক হিসাবে তাকে বেশ কিছু উপঢৌকন দিতে হবে। সংসারে বৃদ্ধা মা ছাড়া আর কেই বা আছে। অন্যান্য ভাইরা সবই উপযুক্ত। তারা সকলেই বিদেশে, বোনদের সকলেই উপযুক্ত পাত্রে পাত্রস্থ। নিজের ভাগ্যকে রীতা কখনও দোষে না। ভাগ্যের গতিপথকে সে মেপে নিয়েছে। অন্যথায় পঙ্কজকে সে বিচারের সম্মুখে খাড়া করাতে পারতো। সেই পথ থেকে সে ক্ষান্ত। পঙ্কজ কিন্তু একদিন তার ভুল ত্রুটি স্বীকার করে রীতার কাছে ধরা দিয়েছিল। এই ভুল ত্রুটি পঙ্কজের মজ্জাগত এই কথাও সে স্বীকার করেছিল। চতুর পঙ্কজ রীতার সাথে সব সময় যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করতো রীতা অন্য কোন পথ নিলে তাঁর নতুন সংসারে কোন বাধা না আসে।

এবার আসা যাক মিঃ এবং মিসেস থিরানীর সংসার জীবনে। মেয়েরা সকলেই সুপাত্রস্থ। ছেলে পঙ্কজ। বাবা মিঃ থিরানী অনেক চেষ্টা করেও তার নিজের ব্যবসায়ে ওকে ধরে রাখতে পারে নি। পঙ্কজের জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতার পরিণামে ভবিতব্য এই ছিল। মিঃ থিরানী পঙ্কজের এই জীবনকে কখনও মেনে নিতে পারেন নি। সে কিছুটা প্রশ্রয় পেয়েছিল মা মিসেস থিরানীর মধ্যে।

একমাত্র ছেলে পঙ্কজ। সে একটা ভুল করেছে। মানুষ মাত্রেরই ভুল হতে পারে। কিন্তু মিসেস থিরানী এটা বুঝে উঠতে পারেন না যে পঙ্কজের এই ভুল কিন্তু বুঝে শুনে। অন্যের জীবনের ক্ষতি করে। এটা কিন্তু মোটেই অপরিণামদর্শীতার ফল নয়। তারপরে ছেলের ঘরে দুই ছেলে। মেয়েদের দুর্বলতা একটু বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। মিঃ থিরানীর বয়স হয়েছে। ছেলে যদি কোন আপোস মীমাংসা করে থাকে তাতে মিঃ থিরানীর কি আসে যায়। তাছাড়া অনিতার প্রতি তাদের যে অপরিসীম স্নেহ ভালবাসা তা কি করে বিসর্জন দেবে। অনিতা তো তাদের বংশেরই মেয়ে। মমত্ববোধ আরও বেড়ে যায়। যেহেতু বলতে গেলে অনিতা মাতৃহারা। মিসেস থিরানীর কিন্তু এখন একটাই প্রচেষ্টা কি করে অনিতা রীতাকে ভুলে লীনাক্ষীর প্রতি মাতৃত্বের ভালবাসায় আবদ্ধ হয়ে থাকে। আর এও ভাবে ভবিষ্যতে এই স্নেহ কতটা থাকবে? এই ভাবনায় তার মন কিন্তু দিনের পরদিন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সব সময়ের জন্য তার মনও এই চিন্তায় চিন্তিত।

সময়ের গতি আপন মনে চলে। এই তিন বাড়ীর সমস্ত মনোযোগ কিন্তু অনিতাকে নিয়ে। সব সময় এই তিন বাড়ীর খোঁজ খবরও অনিতাকে নিয়ে। রীতা তার চিন্তাধারার গতি মেডিটেশনের-এর মাধ্যমে কিছুটা পরিবর্তন করে নিয়েছে। সে চায় তার মেয়ে সুখে থাকুক। সুন্দর জীবন নিয়ে গড়ে উঠুক। মেয়ে এখন বড় হয়ে উঠেছে। সে আস্তে আস্তে সব বুঝে উঠতে পারবে। অনিতা যে তারই সন্তান সে সত্য কখনই কেউ লুকিয়ে থাকতে পারবে না। তার বিয়ের জন্য কিছু একটা যৌতুক দেবার জন্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থা গড়ে তুলছে। এই যৌতুকের মাধ্যমে অনিতা বুঝতে পারবে তার আসল মা তাকে কখনও কোন জিনিষ হতে বঞ্চিত করে নি। প্রকৃত ভালবাসায় চিহ্ন হয়ে থাকবে এই যৌতুক।

অনিতা গ্রাজুয়েট হয়েছে। এই খবর মুখে মুখে সব জায়গায় পৌঁছে গেছে। রীতা একখানা টেলিগ্রাম মারফৎ কনগ্রেচুলেশন জানিয়েছে। যতগুলো অভিনন্দন পত্র কিংবা টেলিগ্রাম এসেছে অনিতার হাতে দেওয়া হয়েছে। তার একটা মাত্র অভিমান রীতার কাছ থেকে সে কিছুই পায় নি। তাই মনের জ্বালায় কিন্তু রীতার প্রতি বিদ্বেষ আরেক ধাপ এগিয়ে রইল। অনিতার ইচ্ছা সে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে। ভর্তির জন্য ব্যাঙ্গালোরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হতে ভর্তির ফর্ম আনতে যায়। সাথে পঙ্কজ যায়। ফর্ম পেতে দেরী হবে। পঙ্কজ তার বিশেষ কাজ থাকার জন্য অনিতাকে ফর্ম তুলতে বলল এবং জানাল সে এক ঘণ্টার

মধ্যে এসে তাকে নিয়ে যাবে। অভিমানী মন নিয়ে অনিতা রীতাকে ফোন করে। রেগে রীতাকে আঘাত করে কিছু কথাবার্তাও বলে। রীতা সব চুপ করে শোনে এবং বলে তোমার পাশের খবর পাওয়ার সাথে সাথে কনগ্রেচুলেশন টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছে। কেন পেলে না তা সে কি করে বলবে। গ্রিটিংস টেলিগ্রামের রসিদখানা তার নিকট যত্ন করে রাখা আছে। অনিতা, তুমি শুধু শুধু আমার উপর রাগ করেছো। রসিদখানা তোমাকে দেখাবো। অনিতা এই খবর শুনে হতবাক। দুইজনেই বাই বাই করে টেলিফোন ছেড়ে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে পঙ্কজ এসে অনিতাকে নিয়ে যায়। লিনাণ্ডীকে এবং পঙ্কজকে সে ভর্তির ফর্মটি দেখায়। তিনদিনের মধ্যেই কলেজের ফর্মটি জমা দিতে হবে। এদিকে রাত্রে ফোন আসে মিঃ এবং মিসেস থিরানীর। লিনাণ্ডীকে বলে অনিতার জন্য পাত্র দেখতে। পাত্রটি যেন তাদের পছন্দসই হয়। পঙ্কজ বলে অনিতার জন্য আজই কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বার ফর্ম তোলা হয়েছে। কারণ অনিতার খুব ইচ্ছা সে এই লাইন নিয়ে পড়বে। মিসেস থিরানী বলেন, তাতে কি আসে যায়, আরে এখন থেকে দেখাশুনা শুরু হোক না কেন। কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং তো চার বৎসরের কোর্স। দেখতে দেখতে চার বৎসর কেটে যাবে। অনিতা রাত্রে আবার গ্রীটিংস টেলিগ্রামগুলো খুলে দেখে। কিন্তু কই মিলছে না তো? কোথায় রীতার গ্রিটিংস? লিনাণ্ডী জিজ্ঞাসা করে, আবার গ্রিটিংস কার্ডগুলো নিয়ে বসেছো কেন? না এমনি দেখছিলাম, উত্তর দেয় অনিতা। মনে কিন্তু দ্বন্দ্ব একটা থেকেই যায়।

আজ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হওয়ার তারিখ। সকাল থেকে অনিতা এবং পঙ্কজ দুইজনই ব্যস্ত। সকাল ১০টা থেকে লাইনে দাঁড়াতে হবে। ছেলে মেয়েরা সারিবদ্ধ ভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে। অনিতাও লাইনে আছে। ইতিমধ্যে পঙ্কজ লাইনে দাঁড়ানো একটি ছেলেব সাথে আলাপ করছে। এর নাম সমৃদ্ধ। সমৃদ্ধের বাবা একজন খ্যাতনামা ব্যবসায়ী। ব্যাঙ্গালোরেই তাদের বাসস্থান। সমৃদ্ধের বাবা দীপনারায়ণ আবার পঙ্কজের বিশেষ বন্ধু। পঙ্কজ সমৃদ্ধের সাথে অনিতার পরিচয় করে দেয়। সমৃদ্ধ লাইনে ছিল অনিতার থেকে ছ'জনের আগে। কিন্তু অনিতার যাতে একটু আগেই হয়ে যায় তার জন্য লাইন উভয়ের মধ্যে পরিবর্তন করে নেয়। অনিতা একটু আগে ভর্তি হয়ে সমৃদ্ধকে বাই বাই করে চলে যায়। ভর্তি হওয়ার দশদিন বাদেই ক্লাস শুরু হয়ে যায়। অনিতা এবং

সমৃদ্ধের একই সেকশনে নাম উঠেছে। দুইজনেই বিশেষ আগ্রহ সহকারে ক্লাশ করছে। পড়াশুনার ব্যাপার নিয়ে দুইজনেই আলাপ-আলোচনা করে। একদিন অনিতা নিজের গাড়ীতে করে সমৃদ্ধকে তাদের বাড়ী নিয়ে যায়। পঙ্কজ খুব খুশী মেজাজে রিসেপশন দেয়। লিনাঙ্গীর চোখে কিন্তু এই সব অসহ্য। অনিতা কেনই বা সমৃদ্ধের সাথে এমনভাবে চলাফেরা করবে—এই সব কথাই একদিন পঙ্কজকে বলে ফেলল। পঙ্কজ এই সব কথার মোটেই আমল দেয়নি। শুধু বলল 'নাউ সি ইজ গ্রোনআপ'। অনিতার কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস ভাল চলছে। পঙ্কজ অনিতার জন্য বাড়ীতে একটি কমপিউটার কিনে দিয়েছে। এতে অনিতার বাড়ীতে বসে প্রাকটিস-এর অনেক সুবিধা হয়েছে। কলেজ থেকে বাড়ী ফেরার পথে অনিতা প্রায়ই রীতা মার সাথে ফোনে কথা বলে। সন্দিগ্ধমনে লিনাঙ্গী প্রায়ই অনিতাকে জিজ্ঞাসা করে তোমার আজ একটু দেরী হলো কেন? কলেজ ছুটির সময় থেকে বাড়ী ফেরা পর্যন্ত একটা সময় নির্ধারণ করা আছে। তার পর হলেই অনিতাকে লিনাঙ্গীকে কৈফিয়ৎ-এর সম্মুখীন হতে হয়। মাঝে মাঝে সমৃদ্ধের সাথে গল্প গুজবেও সময় কিছুটা অতিবাহিত হয়। প্রথম বৎসরের পরীক্ষার ফল অনিতার খুবই ভাল হয়। দ্বিতীয় বর্ষে পড়াশুনার চাপ খুবই বেশী। সমৃদ্ধ পড়াশুনায় বরাবরই খুব ভাল ছাত্র। প্রথম পর্ব পরীক্ষায় তার ফল খুবই ভাল হয়েছে। অনিতা এবং সমৃদ্ধের মধ্যে পড়াশুনা নিয়ে খুব চর্চা হয়। দু'জনের মধ্যে একদিন ক্যাম্পাস পরীক্ষা নিয়েও আলোচনা হয়। চতুর্থ বর্ষ উত্তীর্ণ হওয়ার পর এরা বসবে ক্যাম্পাস পরীক্ষায়। যেখানে বহু কোম্পানীতে কাজের সুযোগ আসে। তারা এই সব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলো থেকে তাদের মনোনীত প্রার্থীদের বাছাই করে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর ভাল মাহিনা দিয়ে এদের নিয়োগ করে থাকে। একদিন অনিতা বলে, জানিনা তোমার সঙ্গে আর কতদিন থাকতে পারবো। সমৃদ্ধ বলে, কেন? এমনও তো হতে পারে যে ক্যাম্পাস পরীক্ষার হতে কোন বহুজাতিক সংস্থা হয়তো আমাদের দু'জনকেই চয়েস করলো। অনিতা বলে, না সমৃদ্ধ, আমার জীবনে হয়তো অনেক বাধা আসতে পারে। তাই ভাবি কি হবে জানিনা। আমার সব থেকেও যেন মনে হয় কি জানো? না থাক। সমৃদ্ধ অনিতাকে জিজ্ঞাসা করে, বলো না কি তুমি ভাবছ! না থাক ও সব কথা। সমৃদ্ধ বলে, ও বুঝেছি তোমার বিয়ের বুঝি সম্বন্ধ দেখা হচ্ছে। জান, কয়েকদিন আগেই আমার বাবাকে তোমার বাবা কি যেন

বলছিলেন। অনিতা-কি বলছিলেন? ও সব কথাই। তোমাকে বিয়ে দেবে। তাই পাত্র দেখার জন্য তোমার বাবা-মা উঠে পড়ে লেগেছেন। এদিকে রীতা অনেকদিন যাবৎ অনিতাকে দেখে না। অনিতার সাথে ফোনে রীতা কথা প্রসঙ্গে বলে অনিতা তোমার ফাইনাল পরীক্ষা সামনে, ভালভাবে কলেজ করবে। এর উপর কিন্তু তোমার ভবিষ্যত জীবন। অনিতা জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা মা! পরীক্ষা হয়ে গেলে আমি কিন্তু তোমার কাছে আসবো। ও সব কথা পরে হবে। আগে তো পরীক্ষা দাও। এদিনেই অনিতা সমৃদ্ধের সাথে রীতা মার কথা বলিয়ে দেয়। রীতা সমৃদ্ধের বাবা-মাকে ভাল ভাবেই জানে। অনেকদিন আগে বিয়ের দিন কোলকাতাতেই পঙ্কজ রীতাকে সমৃদ্ধের বাবা-মার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। তখন সমৃদ্ধের জন্ম হয়নি। রীতা মনে মনে কি যেন একটু ভেবে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়। আজ এতসব কাণ্ড করতে করতে অনিতার খুব দেরী হয় যায়।

লিনাণ্ডী বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। অনিতার গাড়ী আসতে দেখে লিনাণ্ডী ঘবের ভিতরে চলে যায়। অনিতা ঘরে ঢুকতেই লিনাণ্ডী খুব চেঁচিয়ে ওঠে। বিয়ে দিতে পারলে বেঁচে যাই। আজ তোমার বাবাকে বলবো। পরীক্ষা হয়ে গেলেই যেন তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করে। তুমি দিনকে দিন বেয়াদব হয়ে উঠছো। হবে না কেন? যেমন মা তেমন মেয়ে। আজ কিন্তু অনিতা তার চোখের জল ধরে রাখতে পারলো না। একটু পরে পঙ্কজ বাড়ীতে এসে পড়লো। লিনাণ্ডীর মেজাজ তখনও ঠিক হয়নি। অনিতার সামনেই লিনাণ্ডী পঙ্কজকে খুব কড়া মেজাজে শাসাতে শুরু করলো। এও বলতে শুরু করলো শীঘ্রই যেন অনিতার বিবাহের ব্যবস্থা করে তা না হলে ওদের দুই ছেলেও বিপদগামী হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। পঙ্কজ শুধু লিনাণ্ডীকে বললো এ সব তুমি কি বলছ! তোমার ব্যবহার ঠিক রাখো। তোমাকে আগেই বলেছি। ‘সি ইজ ম্যাচিওরড নাও।’ সেই ভাবে ব্যবহার করো। কলেজে দেরী হতেই পারে। মনে রাখবে এটা অনিতার ফাইনাল ইয়ার। আর কয়েকমাসের মধ্যে ফাইনাল পরীক্ষা। তাছাড়া কলেজের পরে অনিতা সমৃদ্ধের সাথেও পড়াশুনা নিয়ে আলোচনা করে। লিনাণ্ডী কিন্তু এদিকে অনিতার জন্য পাত্রের খোঁজে বলে বেড়াচ্ছে। দু’একটি যা সন্ধান পাচ্ছে তাই মিঃ এবং মিসেস থিরানীকেও ফোনে জানাচ্ছে। কিন্তু কোনটাই মনোমত হচ্ছে না। একদিন কথায় কথায় পঙ্কজ সমৃদ্ধের কথা বলে। এও বলে, হি ইজ ব্রাইট বয়। কিন্তু লিনাণ্ডীর মোটেই পছন্দ নয়। উলটে সমৃদ্ধ

সম্বন্ধে যা তা মন্তব্য করে বসে। না জেনেই লিনাণ্ডী এসব কথা বলে। এ সব কিন্তু অনিতার পক্ষে যায়। অনিতা সমৃদ্ধের সাথে এখনও তাদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে অতটা নিগূঢ় নয়। কারণ দু'জনের এখন একটাই উদ্দেশ্য পাশ করা। ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় এরপর ঠিক হবে। ফাইনাল পরীক্ষার দিন ঘোষণা হয়ে গেছে। অনিতা এবং সমৃদ্ধ-র দুইজনেরই পড়ার খুব চাপ। পড়াশুনার জন্য কলেজে এবং বাড়ীতে খুবই সময় দিতে হচ্ছে। অনিতার ফোন পেয়ে রীতা একদিন অনিতাকে বলে—অনিতা এখন আর ঘন ঘন ফোন করো না। মনযোগ দিয়ে পড়াশুনা করো। ভাল ফল করা চাই। সামনে তোমার প্রকৃত জীবন। এই সংগ্রামে তোমাকে জয়ী হতে হবে।

আজকাল রীতার শরীর খুব ভাল যাচ্ছে না। নিজের ব্যবসা অনেকটা বাড়িয়ে নিয়েছে। হাইপার টেনশন ও আর্থারাইটিস দ্বারা আক্রান্ত। মাঝে মাঝে ডাক্তারী পরীক্ষাতে যেতে হয়। যোগব্যায়ামের মাধ্যমে সে সব ভুলে থাকতে চায়। আধ্যাত্মিক যোগ রীতাকে এই শিক্ষা দেয়—জীবনে দুশ্চিন্তার উর্ধ্বে থেকে কাজ করো। জীবনে সুখ এবং দুঃখ দুইই থাকে। কোনকিছুতেই বিচলিত হলে চলবে না। এই সত্তাই আজ রীতাকে পেয়ে বসেছে। জীবনের ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।

রীতার ফ্ল্যাট বাড়ীতে এখন বৃদ্ধা মা এবং ছোট ভাই। দু'জনের দেখাশুনার দায়িত্বও রয়েছে। বৃদ্ধ মা প্রায়ই অসুস্থ থাকেন। ছোট ভাই বর্তমানে রীতার ব্যবসায় জড়িত। তার জন্য রীতা বিয়ের সম্বন্ধ দেখছে। ছোট ভাই একটু চঞ্চলমতি। কাশ্মীরে কিছুদিন এক বন্ধুর সাথে বস্ত্র ব্যবসায় ছিল। তখন এক কাশ্মীরি মেয়েকেও বিবাহ করেছিল। বর্তমানে ডিভোর্সি। রীতার ভাই বোনরা কেউ থাকেন আমেরিকায় কেউ বা পশ্চিম জার্মানীতে। ভাই বোনদের ডাকে মাঝে মধ্যে রীতাকে তাদের কাছেও যেতে হয়। একটু বেড়িয়ে আসা। সকলেই রীতাকে খুব ভালবাসে।

এদিকে ফাইনাল পরীক্ষায় অনিতা খুব ভাল ফল করেছে। কলেজ থেকে ওকে প্রাইজ দেওয়া হয়েছে। এবার ক্যাম্পাস পরীক্ষার পালা। কলেজ থেকে যে দশজনের নাম টাঙানো হয়েছে তাদের মধ্যে অনিতা রয়েছে। সমৃদ্ধর নামও ঐ তালিকায় আছে। একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা এই ক্যাম্পাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে ছয় জনকে নেবে। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এদের শাখা

রয়েছে। ক্যাম্পাস পরীক্ষার উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের এরা বিভিন্ন শাখায় মনোনীত করবে। ব্যাঙ্গালোরে এদের মূল ট্রেনিং সেণ্টার। ট্রেনিং-এর মেয়াদ তিন মাস। পরবর্তী পর্যায়ে শাখায় পোষ্টিং। এদিন বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষ হতে অনিতার নিকট কনগ্রেচুলেশন বার্তা পৌঁছেছে। অনিতার দুই ভাই-এরও এবার ইচ্ছা দিদির পথ অনুসরণ করা অর্থাৎ কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশুনা করা। দিদিও দুই ভাইকে খুব ভালবাসে। ওদের নিয়ে প্রায়ই পড়াশুনা চর্চা করে থাকে। সিলেকসান বোর্ড যে ছয় জনকে বেছে নিয়েছে তাদের মধ্যে প্রথম নাম অনিতার। তার পরের নামই সমৃদ্ধের। দু'জনকে এখন তিন মাসের জন্য ব্যাঙ্গালোরে ট্রেনিং-এ থাকতে হবে। ট্রেনিং পর্যায়ে এদের বেতন আট হাজার। পরের পর্যায়ে শুরুতে এরা প্রত্যেকে পাবে মাসে বাইশ হাজার।

অনিতাকে নিয়ে চিন্তা ভাবনায় কেউ কমতি যাচ্ছে না। পঙ্কজ ও লিনাণ্ডীর ভাবনা তিন মাস পরে কি হবে? কোথায় পোষ্টিং হবে? কবে কোথায় কিভাবে অনিতাকে বিবাহ দেওয়া হবে। পাত্রই বা কে হবে? এই মুহূর্তে পঙ্কজ চাইছে সমৃদ্ধ-এর বাবা এবং মার সাথে একটা কথা বলতে। কিন্তু তারা রাজী হবে কি? কারণ সবে ট্রেনিং-এ জয়েন করেছে। লিনাণ্ডী কিন্তু রাজী নয় সমৃদ্ধ-এর সাথে বিবাহ সূত্রে অনিতাকে বাঁধতে। সে চায় অন্য পাত্র ঠিক করতে। পরিচিত প্রত্যেকের কাছে বলেও রেখেছে।

মিঃ এবং মিসেস থিরানী কিন্তু খুবই আগ্রহী নাতনির কোলকাতা পোষ্টিং-এর জন্য। কারণ ওদের ফ্ল্যাট থেকে সল্টলেকের অফিস দূরত্ব খুবই কম। অনিতার বিবাহ ব্যাপারেও খুবই আগ্রহী। যদিও আদরের নাতনীর মতামত দরকার।

রীতাও কিন্তু চায় ওর কোলকাতাতেই পোষ্টিং হোক। বড্ড আশা মেয়ের সাথে যোগাযোগ থাকবে। বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে অনিতার মতামতকে সর্বাগ্রে অধিকার দিতে হবে। একদিন ফোনে অনিতা রীতাকে পড়াশুনা সংক্রান্ত ব্যাপারে সমৃদ্ধ-এর কথা বলেছিল। কিন্তু রীতার কাছে সমৃদ্ধ আজ অচেনা এবং আজানা। যদি দু'জনেরই কোলকাতা পোষ্টিং হয় তা হলে হয়তো দেখা যেতে পারে। পাত্র হিসাবে কেমন হবে? নিজের ভাগ্যকে সে দোষারোপ করে। স্বামী থাকতেও সে স্বামীহারা। মেয়ে থাকতেও সে কন্যাহারা। সকল সুখ ভোগের থেকে সে বঞ্চিত। না, থাক ওসব চিন্তা করে আর কি হবে। এ সবই ভাগ্যের

পরিহাস। অনিতা যেন এসব পরিহাসের ফাঁদে না পড়ে। কাছে পেলে অনিতাকে একবার সে বুঝিয়ে বলবে।

তিন মাসের ট্রেনিং সমাপ্ত। দুই তিন দিনের মধ্যে পোষ্টিং-এর তালিকা বেরুবে। এই তিন দিন অনিতা ঘরে থেকেই বাবা-মা ভাইদের সাথে জমিয়ে আড্ডা দেয়। সাথে সাথে ঘরে বসে কমপিউটার-এ কিছু কাজ করে। ভাইদের কমপিউটার সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়। অবশেষে পোষ্টিং তালিকা বেরলো। ছয়জনকে দু'জন করে তিন জায়গায় পোষ্টিং দেওয়া হলো। অনিতা ও সমৃদ্ধকে দেওয়া হলো কোলকাতার সল্টলেক অফিসে। অনিতা একদিকে খুব খুশী। অন্যদিকে মনের দিকে কিছুটা দুঃখিত। সাতদিন সময়। তার ভিতর জয়েন করতে হবে। পঙ্কজ সবার জন্য প্লেন-এর টিকিট করে নেয়। দু'দিন পরেই রওনা হতে হবে। কোলকাতায় গিয়ে সব কিছু গুছিয়ে দিয়ে আসতে হবে। মিঃ এবং মিসেস থিরানীকে অনিতা ফোন করে বলে, দাদা! দিদাজী! বহুত খুশিকা বাত হায় মেরি পোষ্টিং কোলকাতা মিল গিয়া। এই কথা শুনে দাদা ও দিদাজী খুবই খুশী। দিদাজী অতটা খুশী হতে পারেনি কারণ চিন্তা এবং দায়িত্বের বোঝা অনেকটা বেড়ে গেল।

রওনা হওয়ার দিন। এয়ার পোর্টে একই প্লেনে যাচ্ছে সমৃদ্ধ এবং তার বাবা-মা। পঙ্কজের সাথে সমৃদ্ধ-এর বাবা-মার কথা হচ্ছে। সমৃদ্ধ থাকবে পার্ক সার্কাসে তার পিসির বাড়ীতে। পিসির সাথে সে ভাবে কথাবার্তা হয়েছে। বড় বাড়ী থাকায় কোন অসুবিধাই হতে পারে না। পঙ্কজ বলল, অনিতা থাকবে বালিগঞ্জে আমার বাড়ীতে। ঐ বাড়ীতে প্রচুর জায়গা। কোলকাতায় এসে পরের দিন পঙ্কজ অনিতাকে নিয়ে সল্টলেকের অফিসে ঠিক ১০টায় সময় পৌঁছায়। এই কমপিউটার কোম্পানীটির আন্তর্জাতিক ব্যবসা রয়েছে। একটি বিদেশী কোম্পানীর সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চারে কাজ হচ্ছে, তিনতলা বাড়ীখানা। অনেক ছেলে মেয়ে এখানে কর্মরত। অফিসের এক্সিকিউটিভ অফিসার মিঃ ভার্মা অনিতাকে তার কাজের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয় এবং জিজ্ঞাসা করে যে সে আজ হতেই জয়েন করতে ইচ্ছুক কিনা। কারণ হাতে এখনও তিন দিন সময় রয়েছে। অনিতা মিঃ ভার্মার থেকে সময় নিয়ে পঙ্কজকে জিজ্ঞাসা করতে যায়। পঙ্কজ সম্মতি জানাতে অনিতা এদিন থেকেই জয়েন করে। মেয়েকে বলে তোমার ৫টায় ছুটি, আমি গাড়ী নিয়ে এসে তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাব। দুই জনই বাই বাই করে গন্তব্য স্থানে চলে যায়।

অনিতা কিন্তু একবার পঙ্কজকে জিজ্ঞাসাও করেছিল। কি সমৃদ্ধ তো এল না। পঙ্কজ তার উত্তরে বলেছিল সম্ভবত ও কাল জয়েন করবে। আজ বিশ্রাম নিচ্ছে। এদিকে পরের দিনই মিঃ থিরানী নিজের বাড়ীর ড্রাইভারকে অনিতার অফিস যাওয়া-আসার জন্য ঠিক করে। আজ অফিসে অনিতার দ্বিতীয় দিন আর সমৃদ্ধর প্রথম দিন। দু'জন দু'জনকে অফিস গেটে দেখতে পায়। মিঃ ভার্মা সমৃদ্ধকে ডিপার্টমেন্টেই কাজের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়। সমৃদ্ধ কাজ আরম্ভ করার কিছুক্ষণ পরে অনিতাকে বলে 'উই আর লাকি চ্যাপ'। অনিতার তার সদর্থক উত্তরে বলে 'ইয়েস্'। দু'জনেই খুব মনোযোগ দিয়ে অফিস করছে। এবার পঙ্কজের পরিবারের ফিরে যাবার পালা। পঙ্কজ একদিন সমৃদ্ধ-র বাবা-মাকে নিজের বাড়ীতে ডিনারে নিমন্ত্রণ করে। পরের দিন আবার সমৃদ্ধ পঙ্কজের পরিবারকে ওদের বাড়ীতে ডিনারে নিমন্ত্রণ করে। এর পরের দিন দুই পরিবারই তাদের গন্তব্য স্থানে প্লেনে রওনা হয়ে যায়। অফিস থেকে ফেরার সময় প্রায়ই সমৃদ্ধর গাড়ীর ব্যবস্থা থাকে না। কারণ পিসির গাড়ীর ড্রাইভার মাঝে মাঝে না বলে দুপুরের পরে আর আসে না। জিজ্ঞাসা করলে বলে, ম্যাডাম ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, নয়তো শরীরটা ঠিক ছিল না। অগত্যা তখন অনিতাই তার ড্রাইভারকে বলে সমৃদ্ধকে বাড়ী পৌঁছিয়ে দিয়ে আসতে। এদিকে মিসেস থিরানী কিন্তু শক্ত হাতে অনিতাকে ধরে রাখার চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে অফিসে ফোন করে খবরাখবর নেওয়া, অফিস থেকে ফিরতে একটু দেরী হলে জিজ্ঞাসাবাদ করা। লিনাণ্ডীও প্রায়ই অনিতা সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়ে থাকে। একসময় ফোনে বলে ড্রাইভার আনসারী যেন অনিতার চলা ফেরার বিষয় মিসেস থিরানীকে প্রতিদিন রিপোর্ট করে। মিসেস থিরানীকে লিনাণ্ডী সমৃদ্ধর সাথে অনিতাকে বেশী মেলামেশা করতে বারণ করার কথা বলে। শুধু অফিস সংক্রান্ত ব্যাপারে যেটুকু দরকার সেইটুকুই।

কড়া নজরদারীর মধ্যে অনিতা কিন্তু কোলকাতায় আসার পর মায়ের সাথে একবারও যোগাযোগ করতে পারে নি। এদিকে লোকজনের মুখে সব খবরাখবরই রীতা পায়। মেয়ে ভাল থাক এটাই সান্ত্বনা। নিজের মনকে প্রবোধ দেয়। তার আধ্যাত্মিক জগতের এটাইতো শিক্ষা। একদিন অনিতা অফিস থেকে বেরোবার সময় মিসেস থিরানীকে ফোনে বলে, দিদাজী আজ একটু আসতে দেরী হবে কেননা সমৃদ্ধের ড্রাইভার আজ নিতে আসে নি। ওর কিছু জরুরী মার্কেটিং আছে। তারপর বাড়ীতে পৌঁছিয়ে আমি আসছি। দিদাজী জিজ্ঞাসা করে, কত

দেরী হবে? অনিতা উত্তর দেয় ধর দু'ঘণ্টা। দিদাজী ফোন করে সমৃদ্ধের পিসিমা মিসেস আদবানিকে। কিন্তু রিং বেজে যাচ্ছে কেউ ধরছে না। মিসেস থিরানীর আক্ষেপ মিসেস আদবানী হয়তো মার্কেটিং-এ গেছেন, নয়তো টেলিফোন লাইন খারাপ। গাড়ীতে উঠে অনিতা সমৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করে কোথায় যাবে? কি মার্কেটিং করবে? সময় কিন্তু নেওয়া যাবে না। দিদাজী রাগ করবে। না, বেশী দেরী হবে না। টয়লেট জাতীয় দুই তিনটি জিনিস কিনবো। পিসি বলেছেন নুতন এ সি মিনি মার্কেটে যেতে। মিডিলটন রোডে ঐ মাল্টিপারপাস শপে সব কিছু পাওয়া যায় এবং প্রাইসও খুব রিজিনেবল। ওটা এক সিন্ধি মহিলার দোকান। শুনেছি ভদ্রমহিলার ব্যবহারও খুব মিষ্টি। শুনেই অনিতা যেন কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। সে বলে, ভালই হলো, চলো। তবে জিনিসের যা দাম হবে তা কিন্তু আমিই দেবো। প্রমিস? সমৃদ্ধ বলে, তা হয় না, পিসিমা শুনলে খুব রাগ করবে। পিসিমা ঐ দোকান থেকেই সব কেনাকাটা করেন। অনিতা—তাই নাকি! তা হলে তো বলবো ভালো। কারণ দু'জনই সিন্ধি। দেখতে দেখতে কাছে গাড়ী থামে। অনিতা দেখে এতো তার চেনা পরিচিত জায়গায়। তবে খুব একটা বুঝে উঠতে পারছেনা। অনেকদিন হলো তো। ড্রাইভারকে বলে গাড়ী পার্কিং-এ লাগাতে। অনিতা সমৃদ্ধকে বলল তুমি যাও আমি আসছি। সমৃদ্ধ দোকানের ভিতর গিয়ে দেখে পিসি এক ভদ্রমহিলাল সাথে কথা বলছেন এবং কিছু জিনিষপত্র সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। ভদ্রমহিলা সমৃদ্ধকে দেখে জিজ্ঞাসা করেন, 'হোয়াট ইজ ইওর চয়েস? পিসিও সমৃদ্ধকে দেখে এগিয়ে আসেন এবং বলেন আরে! কি নেবে আমাকে বললেই পারতে। কষ্ট করে এখানে এলে কেন? তাছাড়া আজ তোমার সাথে গাড়ী নেই। সমৃদ্ধ বলে, না পিসি কোন অসুবিধাই হয়নি। গাড়ী করেই এসেছি। গাড়ী? গাড়ী কোথায় পেলে? কেন! অনিতাই নিয়ে এসেছে। ও আমার বাড়ী থেকে তারপরে ওর বাড়ীতে যাবে। পিসি চলো আমরা একসাথেই যাবো। আমি এখান থেকে কয়েকটা টয়লেট সেট নেবো। বেশী দেরী হবে না। পিসি বলেন, না সমৃদ্ধ তুমি এগোও। আমি একটু ফ্লুরিস-এ যাবো। তারপর ট্যাক্সি করে আসছি। ফ্লুরিস পর্যন্ত একটু হাঁটাও হবে। এদিকে রীতা কিন্তু সবই শুনছিল। কারণ কাছে দাঁড়িয়েই নতুন ক্রেতার উপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। সপ্রতিভ কিছু একটা আকাঙ্খিত নেত্র দরজার দিকে তাকিয়ে। কে এই অনিতা? আমার অনিতা নয়তো? আবার ভাবে আমার অনিতাকে চিনতে পারব তো?

এতদিনে সে অনেক বড় হয়েছে। মুখের চেহারাও নিশ্চয়ই পাল্টিয়েছে। নিশ্চয়ই আরও বেশী লম্বা হয়েছে। এমনিতেই তো ওর একটু লম্বাটে চেহারা ছিল। রীতার মনে এই সব ভাবনা। অনিতা শো-রুমের বাহিরের দিকে থাকা শো-কেসের জিনিসপত্র বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখছে। পার্শ্ববর্তী পরিবেশের কিছু কিছু ধরা পড়ছে ছোটবেলার স্মৃতির আয়নার। আর কতক্ষণ, অনিতার ভাবনা দেরী হয়ে যাবে না তো? প্রমিসে সে আবদ্ধ। সমৃদ্ধর সব কেনাকাটার পর পয়সা দিচ্ছে না তো? বাড়ীর পুরানো দারোয়ানরা অনিতার দিকে একটু উঁকি ঝুঁকি মারছে। তারা তাকে ছেলেবেলায় দেখেছে। কেউ কাউকেও জিজ্ঞাসা করতে সাহস পাচ্ছে না। এবার কিন্তু অনিতা দরজা খুলে এসি শোরুমে ঢুকে পড়লো। দ্যাখে সমৃদ্ধ ক্যাস কাউন্টারে সব জিনিসপত্র মিলিয়ে নিচ্ছে এবং ক্যাশিয়ার হিসাব করছে। দেখেই অনিতা ছুটে যায় ক্যাস কাউন্টারের দিকে। একি হচ্ছে সমৃদ্ধ? প্রমিস ইজ প্রমিস। ক্যাশিয়ারকে বলে, আপনি ক্যাশমেমো আমাকে দেবেন। এদিকে রীতা এবং সমৃদ্ধ-এর পিসি অনিতার দিকে এগিয়ে আসে। অনিতাকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কেমন আছ? অনিতা উত্তরে বলে, পিসি আই এম ফাইন। আপনি ভাল আছেন তো? অন্যদিকে বেচারী রীতা এসব দেখে ধৈর্যহারা। তাড়াতাড়ি অনিতাকে জিজ্ঞাসা করে—আমার অনিতা, কেমন আছো? অনিতাও আবেগে রীতাকে জড়িয়ে ধরে। দু'জনের চোখেই এক অভিভূত আবেগে অশ্রু পূর্ণ। আর এই দৃশ্যের সাক্ষী যারা, অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আর এর ভিতর তাৎপর্য খুঁজে বেড়াচ্ছে তারা হচ্ছে সমৃদ্ধ এবং তার পিসিমা। রীতা ক্যাশিয়ারকে বলে, ঐ ক্যাশমেমোটা আমাকে দেবেন। রেখে দিন। অনিতা সমৃদ্ধ এবং ওর পিসিমাকে রীতা মার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। রীতা সবাইকে ওর ফ্ল্যাট-এ যেতে বলে চা পানের জন্য কিন্তু অনিতা বলে আজ, এমনিই খুব দেরী হয়ে গেছে মাম্মী। ওদিকে দাদাজী এবং দিদাজী খুব চিন্তায় থাকবে। আজ আমরা চলি। সমৃদ্ধ এবং পিসিকে ওদের বাড়ী পৌঁছিয়ে তবে ফিরতে হবে। রীতা ওদের সি অফ করে সোজা ফ্ল্যাটে চলে যায়। শো-রুমে বলে যায় সে ফ্ল্যাটে চলে যাচ্ছে। কর্মচারীরা যেন যথাসময়ে শো-রুম বন্ধ করে।

পাঠক, প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে এখানেই উপন্যাসের সমাপ্তি ঘোষণা করতে পারতাম। কিন্তু জানি আপনারা এতে পরিতৃপ্ত হবেন না। তিন সংসারের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে অনিতা। ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে অনিতা নিজেও

জানে না সে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। আজকের দিনে অনিতার স্থিতি কোথায়? আসুন এই নিয়ে আমরা একটু চিন্তা ভাবনা করি। অনিতা একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, চাকুরীজীবি, স্বাবলম্বী স্মার্ট বয়স্কা মেয়ে। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারীং এবং চাকুরীর ক্ষেত্রে অনিতা সহায়ক হিসাবে কাছে পেয়েছে একজন নিষ্ঠাবান এবং সৎচরিত্রের ছেলে সমৃদ্ধকে। এদের জীবনে চলাফেরার মধ্যে একটি রুচিপূর্ণ সংগতি রয়েছে। জীবনে নিষ্ঠা সহকারে অগ্রগতিই যেন এদের প্রতিজ্ঞা। দেখলে মনে হয় ভগবান যেন এদের একসূত্রে গেঁথে পাঠিয়েছে।

এবার ভবিষ্যতের যে পথে আমি পা বাড়াতে যাচ্ছি আশাকরি পাঠক তার ঘাত-প্রতিঘাত আর উঠানামার ব্যাকুলতা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারবেন।

রীতার মনে কিন্তু সমৃদ্ধ এবং সমৃদ্ধ-এর পিসিকে নিয়ে একটা আশংকা থেকে যায়। তারা তো কিছুই জানে না। আমি সত্যিকারের কে? কিইবা অনিতার সাথে আমার সম্পর্ক। ব্যাঙ্গালোরে পঙ্কজের পরিবার কে? লিনাণ্ডীর সাথে অনিতার আসল সম্বন্ধ কি? সমৃদ্ধ এসব জানতে পারলে অনিতাকে তখন কি ভাবে দেখবে? ওদের ভালবাসাটুকু অটুট থাকবে তো? কখনও যদি সমৃদ্ধ-এর পিসি কোন শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে আসে তখন কি হবে? কিভাবেই বা তাকে সব কিছু জানাবেন? এই সব চিন্তা ভাবনা এসেই যায় কিন্তু তাকে তো ঠিক করে বুঝিয়ে বলতে হবে। এই সব সাত পাঁচ ভেবে রীতা ঠিক করে অনিতার সাথে পরামর্শ করে একদিন সমৃদ্ধ এবং সমৃদ্ধের পিসিকে ছুটির দিন দেখে নিমন্ত্রণ জানাবে।

অনিতা একদিন অফিস থেকে রীতাকে ফোন করলে সে অনিতাকে অতি অবশ্য দেখা করতে বলে। অনিতার মনে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়। সে সেদিনই অফিস ফেরৎ পথে রীতার সাথে দেখা করে। রীতা অনিতাকে ফ্ল্যাটে বসে মনের কথাগুলো বলে। পরামর্শ চায় যাতে সে সমৃদ্ধের পিসির সাথে খোলাখুলি নিজেদের পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ে আগে থেকেই জানিয়ে রাখতে পারে। অনিতা বলে, সে সমৃদ্ধকে সব কিছুই জানিয়েছে। রীতা তখন জানতে চায় অনিতা কি বলেছে? সত্যিকারের মায়ের স্নেহ কেউ কাউকে দিতে পারে না। আমার মনে হয় তোমার জীবনেই তাই। তবে কি জান নাটকে এও দেখেছি কোন মা-ই আসল মা-র থেকে তাকে টেনে বেশি দিন রাখতে পারে না। যখন তার মানসিকতার শিখা ধীরে ধীরে প্রজ্বলিত হতে থাকে তখন কিন্তু আসল মা-এর হৃদয়ের শিখা প্রখর হয়ে উঠে। তখন এই দুই শিখার আকর্ষণ একজন অপরজনকে টেনে

সামনে নিয়ে আসে।

অনিতার মুখে রীতা শোনে। শুনে মুগ্ধ হয়ে বলে, হ্যাঁ অনিতা, সমৃদ্ধ তোমার আমার মনের অভিব্যক্তি বুঝতে পেরেছে। কিন্তু ওর পিসি মিসেস আদবানী এসব কিছু জানে? অনিতা—তা তো ওকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি। আচ্ছা মাম্মী, সমৃদ্ধের পিসি কি তোমার ওখানে সপিং করতে আসে?

এর ভেতর আমার সাথে দেখা হয়নি। তবে শুনেছি উনি আসেন। অনিতা বলে—আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন? মাম্মী তুমি যা প্ল্যান করেছো তাই করো। তবে শুধু সমৃদ্ধের পিসিকে ছুটির দিনে নয়, অন্য যে কোন দিনে ডাক। কারণ ওর পিসির সাথে যখন একটা ঘরোয়া সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তখন সব কিছু জানিয়ে রাখা উচিৎ। তাতে ভবিষ্যতে কখনও ভুল বোঝার অবকাশ থাকবে না। আজ আমি উঠবো। বেশী দেরী হলে দাদাজী এবং দিদাজী চিন্তা করবে। উভয়ে বাই বাই। হঠাৎ এরই দু'দিনের মাথায় মিসেস আদবানী সপিং-এ আসেন। রীতার সাথে দেখা হয়। রীতা পরের দিন তাঁকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করতে মিসেস আদবানী বলে ওঠে লাঞ্চে নয় ইভনিংটিতে আসবে। আমার কিছু জরুরী কথা আছে। রীতাও সেই মতো ইভনিং হাই-টির নিমন্ত্রণ করে। কিন্তু রীতার মনে একটা সংশয় দেখা দেয়। রাত্রে ঠিকভাবে ঘুমোতে পারেনি। পরের দিন অফিসে গিয়েই সমৃদ্ধ এই খবর অনিতাকে জানায় এবং বলে আজ অফিস থেকে ফেরার পথে পিসিকে তোমার মাম্মীর বাড়ীর থেকে নিয়ে যাবার আছে। একটু আগেই অফিস থেকে অনিতা মাম্মীকে অর্থাৎ রীতাকে জানায় এবং সমৃদ্ধের জন্যও হাই-টির ব্যবস্থা রাখতে। মিসেস আদবানীর বিকেল পাঁচটায় আসার কথা। রীতা তার শপের মধ্যে পায়চারী করছে। ভাবতে ভাবতে মিসেস আদবানী এলেন। রীতা তাদের রিসেপশান জানিয়ে তার উপরের ফ্ল্যাটে লিফ্‌টে করে নিয়ে গেলেন। এই চায়ের আসরে দু'জন ছাড়া আরও একজন উপস্থিত ছিলেন। তিনি হলেন রীতার মা মিসেস আদবানী আজ হাই-টিতে আসবে। এও জানিয়ে রাখে অফিস থেকে বেরিয়ে সমৃদ্ধ তার পিসিকে নিতে আসবে। খুব বিচক্ষণ ভদ্র মহিলা এই বিজলানী। রীতা জানে আজ অনিতার এক বিশেষ ভবিষ্যৎ জীবন নির্ধারিত হতে চলেছে তাই পাশে তার মার থাকাটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে মিসেস আদবানী বলে ফেলেন সমৃদ্ধের বাবা এবং মা প্রায়ই ফোনে বলে সমৃদ্ধের জন্য একটি পাত্রী দেখতে। তবে আমার কিন্তু অনিতাকে

খুব পছন্দ এবং দু'জনে খুব ম্যাচ করবে। মিসেস আদবানী এই কথা বলে রীতা এবং মিসেস বিজলানীর দিকে তাকিয়ে থাকেন তাঁদের মতামত জানতে। রীতা তার মার দিকে তাকিয়ে বলে এটা খুব ভাল প্রোপোজাল। কিন্তু মিসেস আদবানী, আপনার সাথে এই ব্যাপারে কিছু কথা আছে। আমাদের সব কিছুর সম্পর্কটা আপনাকে খোলাখুলিভাবে জানাতে চাই কারণ ভবিষ্যতে যেন কখনো ভুল বোঝাবুঝি না হয়। এসব আগে থেকে জেনে রাখা ভাল। আহাঃ, মিসেস রীতা-আমি সবই জেনেছি এবং সমৃদ্ধের সাথে আমার খোলাখুলি আলোচনা হয়েছে বলেই আজ আমি এসেছি। হঠাৎই রীতার চোখে জল। সে বাকরুদ্ধ হয়ে যায়, কোন কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারে না। মিসেস আদবানী তখন মিসেস বিজলানীকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে—যত দোষ তো মেয়েদের দিকে। আইনের তোয়াক্কা করে না এই জাতীয় পুরুষেরা। এদের ভিতরে প্রকৃত ভালবাসা কখনো জন্মায় না। নেশাখোরের মত মত্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় এরা। সংসারের নিয়ম শৃঙ্খলার কোন বাঁধন থাকে না। রীতার মত স্ত্রীরাই পারে এদের আইনের ছোঁয়ার বাইরে রাখতে। তাই পার পেয়ে যায়। ইতিমধ্যে শপ থেকে ফোন পেয়ে রীতা নিচে চলে যায়। সমৃদ্ধ এসেছে পিসিকে নেবার জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যে রীতা সমৃদ্ধকে সাথে নিয়ে ফ্ল্যাটে আসে। মিসেস বিজলানী অর্থাৎ রীতার মা সমৃদ্ধকে একবার ভালভাবে দেখে নেয়। উভয়ের নমস্কার বিনিময় হয়। সমৃদ্ধকে দেখে মিসেস বিজলানী খুব খুশি। খুবই পছন্দ। নাতজামাই করতে অপছন্দ কে করবে? মিসেস বিজলানী সমৃদ্ধকে নিয়ে ভিতরের ঘরে চলে যায়। ওর জন্য চা এবং স্ন্যাক্স ভিতরের ঘরের পাঠাবার জন্য বলে। তিনি খুব বুদ্ধিমতী মহিলা। দুই দিকে সামাল দেওয়া একমাত্র এই ধরনের মহিলার দ্বারাই সম্ভব। নিজে এবার সমৃদ্ধের সাথে খুব আলাপে ব্যস্ত। আর অন্যদিকে রীতা মিসেস আদবানীর সাথে বৈষয়িক আলোচনায় রত। এরপর সমৃদ্ধের তাগাদা পেয়ে পিসিমা উঠে দাঁড়ায়। দুজনে এবার রওনা হবে। মিসেস আদবানী রীতা এবং রীতার মা মিসেস বিজলানীকে নিমন্ত্রণ জানান তাদের ফ্ল্যাটে ডিনার নেওয়ার জন্য। রীতা বললো, কবে যাবে তা পরে ফোনে জানাবে। কারণ এখন তিন চারদিন ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে একটু ব্যস্ত থাকবে। সে ওদের গাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। গাড়ীতে উঠে সমৃদ্ধ বলে অনিতা ভাল আছে। আমাদের দুজনেরই একটা প্রমোশন হওয়ার কথা হচ্ছে। হলে হয়তো ভারতের বাইরে যেতে হতে

পারে। রীতা তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে, সেকি? কোথায়?—হয় আমেরিকা না হয় অষ্ট্রেলিয়া। বাঃ, আমেরিকায় তো আমার দুইভাই থাকে আর অষ্ট্রেলিয়ায় আমার বোন থাকে। মুখের কথা টেনে মিসেস জিজ্ঞাসা করে কবে যাওয়ার কথা? সমৃদ্ধের উত্তর মাস দুয়েক লাগতে পারে। কারণ পাশপোর্ট, ভিসার ব্যাপার রয়েছে। তবে কোম্পানীর তরফ থেকে সব করে দেবে। বেশী দেরী নাও হতে পারে। সাথে সাথে রীতা জিজ্ঞাসা করে—কতদিনের জন্য? সমৃদ্ধ বলে, তা বলা যায়না। তবে কম করে তিন বৎসর তো বটে।

রীতা ফ্ল্যাটে ফিরে সে তার মাকে এই সব কথা বলে। মিসেস বিজলানী সব শুনে বলে খুব শীঘ্রই ডিনারের দিন ঠিক কর! সমৃদ্ধের পিসিকে তা জানিয়ে দেয়। পরের দিন অনিতার অফিসে রীতা ফোন করে জানতে চায় প্রমোশনের কথা। সমৃদ্ধের কথারই ডিটো দেয় অনিতা। রীতা ভাবে মিসেস আদবানীর ডিনারে গেলে অনিতার বিবাহ ব্যাপারে একটা জায়গায় নিশ্চয়ই পৌঁছতে হবে। বলতে গেলে পাকাপাকি ভাবে। তার আগে তো জানানো দরকার মিঃ এবং মিসেস থিরানীকে, পঙ্কজের নিকট হতে আবার কোন বাধা না এসে দাঁড়ায়। রীতা ভাবে মিসেস আদবানী তো আমাদের সব জানে। সে তো এখন আমাদের পরিবারেরই একজন। তার সাথেই এই নিয়ে কথাবার্তা বলা যাবে। রীতার এই অভিব্যক্তির কথা আর কাউকে বলে না। মিসেস বিজলানীও সব শুনে রীতার কথারই সায় দেয়। ছয়দিনের দিন ঠিক হলো মিসেস আদবানীর বাড়ীতে ডিনারে যাওয়ার। রীতা তার আগের দিন অনিতাকে অফিস ফেরার পথে একবার দেখা করতে বলে। অনিতা যথা সময়ে আসে। মা মেয়ে বৈবাহিক বিষয়ে আলোচনা চলে। অনিতা জানে লিনাঙ্গী সমৃদ্ধকে মোটেই পছন্দ করে না। লিনাঙ্গীর প্ররোচনায় পঙ্কজ মিঃ থিরানী এবং মিসেস থিরানীও এই বিবাহে মোটেই রাজী হবে না। অনিতা খুব স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয় সে সমৃদ্ধ ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না। অনিতার খোলাখুলি মনোভাবে রীতার অনেকটা সুবিধা হলো। সন্ধ্যার পরে মিসেস আদবানীর বাড়ীতে রীতা এবং মিসেস বিজলানী হাজির। আজকের সন্ধ্যা এক মাধুর্য্যে পর্যবসিত হলো। মিসেস আদবানী ছাড়াও কথা হলো সমৃদ্ধের বাবা এবং মার সাথে। ওঁরা আজই ব্যাঙ্গালোর থেকে পৌঁছেছেন। প্রথমেই এলো কফি এবং স্ন্যাকস্। উভয়পক্ষই আলোচনা প্রসঙ্গে বৈবাহিক বিষয়ে শুরু করে। রীতার কথা প্রসঙ্গে মিসেস বিজলানীকে জিজ্ঞাসা করে মিঃ

এবং মিসেস থিরানীর সাথে এই নিয়ে কোন কথা হয়েছে কিনা। মিসেস বিজলানী তার উত্তরে বলেন হ্যাঁ কিন্তু তারা দু'জনেই বলেন পঙ্কজ এবং লিনাণ্ডী ব্যতীত তারা একপাও এগোবেন না। এও আমার জানা আছে ওরা চায় নিজেদের পছন্দমত পাত্র জোগাড় করে অনিতার বিয়ে দিতে। আমরা এটাও জানি তারা কখনও সমৃদ্ধকে পছন্দ করেন না। এরা চায় অনিতার জীবনে একটা কঠিন আঘাত আনতে। তা কোন ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। আমি বিশেষভাবে চাই ওদের জীবনে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ। সমৃদ্ধের বাবা-মা এতে খুব খুশি। তখনই বিয়ের দিন ঠিক হয়। বিয়ের আগেই রেজেষ্ট্রি হয়। কারণ বাইরে যেতে হলেও এই রেজেষ্ট্রির প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। অনিতা এবার দাদাজী এবং দিদাজীকে বলে যে সে কয়েকদিনের জন্য মাম্মীর কাছে থাকবে। দিদাজীর আপত্তি থাকলেও দাদাজী মত দেয়। বিবাহের নিমন্ত্রণের চিঠি যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছে যায়। লিনাণ্ডী চিঠি পেয়েই তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। পঙ্কজকে বলে তারা কেউ এই বিয়েতে যোগ দেবে না এবং তাদের তরফে কিছুই করনীয় নেই। সঙ্গে সঙ্গে কথা হয় মিঃ এবং মিসেস থিরানীর সাথে। দুই বাড়ীতেই এই নিয়ে থমথমে ভাব। অনিতা এখন রীতার বাড়ীর থেকেই অফিসে যাতায়াত করছে।

সুন্দর পরিবেশে একটা ভাড়া করা ম্যারেজ হাউসে বিয়ের অনুষ্ঠান চলছে। অনিতার সব সময় নজর তার দাদাজী ও দিদাজী আসবে কিনা। অনিতা বিরাট আশা নিয়ে আছে অন্ততঃ এরা দু'জন নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু কি করে আসবে? তারাও বাঁধা পড়েছে লিনাণ্ডীর ফাঁদে। বিবাহ পর্ব মিটে যাওয়াব পর একখানা ভেলভেটের মোড়া লেডিস ব্যাগে করে রীতা অনিতার হাতে দশ লক্ষ টাকার একখানা চেক দিয়ে অনিতাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে। অনিতা প্রথমে বুঝতে পারেনি এটা কিসের চেক্। পরে বুঝতে পারলো এটা আর কিছু নয় মাম্মীর প্রতি মিথ্যা অপবাদের স্বাক্ষীর নজির এই চেক্খানা।

অনিতা এবং সমৃদ্ধ এখন একসাথেই অফিসে যাতায়াত করছে। কিছুদিনের মধ্যে অনিতা এবং সমৃদ্ধ অফিস থেকে চিঠি পায় তাদের যেতে হবে সেই সুদূর ক্যালিফোর্নিয়াতে। অর্থাৎ ওখানেই বদলি করা হয়েছে। কদিন থাকতে হবে সেসব কিছু ঐ চিঠিতে বলা হয়নি। অনিতা সেই রাত্রিতেই দাদাজি, দিদাজী, পঙ্কজ এবং লিনাণ্ডীকে জানিয়ে দেয়। যাবার দিন আগত। রীতা ওদের জন্য

যাবতীয় সাজ সরঞ্জাম কিনেছে। যাতে ওখানে গিয়ে ওদের কোন অসুবিধায় না পড়তে হয়।

আজ যাবার দিন। ফ্লাইট রাত্রি ৮টায়। অনিতা কাল থেকেই সমৃদ্ধের বাড়ীতে ব্যস্ত ছিল। সব কিছু গুছিয়ে নিয়েছে। ৬টা বাজে। দুটো গাড়ী করে সব এয়াপপোর্টের দিকে রওনা হয়েছে। প্লেনে উঠতে যাওয়ার মুহূর্তে মিঃ থিরানী হঠাৎই উপস্থিত। অনিতার হাতে আশীর্বাদ স্বরূপ একটি প্যাকেট দেয়। বলে, পরে দেখে নেবে কি আছে। সাবধানে যাবে। পৌঁছে ফোন করবে এবং তোমার ঠিকানা জানাবে। এটুকু বলে মিঃ থিরানী গাড়ীতে উঠে বসে এবং চলে যায়। এসবই কিন্তু হয়েছে সবার অগোচরে। প্লেন ছাড়ে। বিদায় ব্যাঙ্গালোর বিদায় কোলকাতা। আর দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদছে রীতা। সবাই মিলে রীতাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে।

সাক্ষী আমি

নিভে যাওয়া দেশলাই কাঠিটা কিন্তু সোজাসুজি খালের জলে পড়ল না। বাতাসের জন্য কিছুটা দূরে গিয়ে পড়ল জলের একদম কাছে। অন্যমনস্ক চোখে সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যায় সুশান্তর। দেশলাই কাঠির গতির সাথে আমার জীবনের গতির বেশ কিছুটা মিল আছে। ছুঁড়ে ফেলার জন্য কাঠিটা সামনের দিকে পাঠাতে প্রথমে সোজাই গেল। শেষ মুহূর্তে বেঁকে গিয়ে জলের বদলে পড়ল ঠিক তার পাশে। এ যেন দ্রুতগামী ট্রেনের চলতে চলতে ভুল লাইনে ঢুকে পড়া। অ্যাকসিডেণ্ট অবশ্য হয়নি। কোন এক সিগনাল ম্যানের তৎপরতায় থেমে গেছে তার ভুল চলা। কিন্তু ঠিক ট্র্যাকে আনার জন্য ব্যবস্থা কখন হবে কেউ জানে না। আদৌ ট্র্যাকে না এনে পুরো ট্র্যাকটাই বাতিল করতে হবে কিনা তারই বা কি নিশ্চয়তা। মনের ভারাক্রান্ত ভাবটা যেন ক্রমশই আরো চেপে বসছে তার ওপর। সুশান্ত ঠিক কিনারা খুঁজে পায় না। মনের ওপরেই তো সবকিছুর প্রভাব পড়ে। তাহলে সে শরীরকে বাদ দিয়ে আর কিসের ওপর চাপবে।

অশান্তি চরমে উঠেছিল আজ সকালে। সপ্তাহের প্রথম দিন সবারই বোধহয় একটু বেশী ব্যস্ততা থাকে। সুশান্তর কিন্তু সোমবার একেবারে বিস্বাদ লাগে। প্রতি সোমবারই মনে হয় সকালেই মুখটা একেবারে তেতো। মাথাটা একদম পাথরের মতো ভারী। আচ্ছা, যদি প্রতি সপ্তাহে সোমবারের বদলে মঙ্গলবার দিয়ে উইক শুরু হতো, তাহলে বেশ হতো তাই না? এরকম একটা চিন্তাভাবনা আজকাল মাথার মধ্যে কাজ করতে শুরু করেছে সুশান্তর। একেবারে সংগোপনে মনের এক অচেতন কোণে কমপিউটার মেমোরির মতো স্টোর হয়ে থাকছে সেগুলো। ক্যামেরার ফ্ল্যাশের মতো যখন সেগুলো ঝলক দিয়ে ওঠে তখন একেবারে বিবশ হয়ে যায় সুশান্ত। একেবারে বোধবুদ্ধিহীন হয়ে যায় সে। তার পরে, ঠিক তার পরেই এক সীমাহীন ক্লান্তি ভর করে তাকে। মনে হয় ঘুমিয়ে পড়ি। একেবারে তলিয়ে যাই, ডুবে যাই এই অনন্ত সুষুপ্তির জগতে।

মৌসুমী সুশান্তদের বাড়িতে কাজে ঢুকেছে প্রায় আট-নয় মাস হয়ে গেল। এটুকু সময়ের মধ্যেই বাড়ীর সবার প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠেছে। পনের-ষোল বছরের মেয়েটার রং কালো। কিন্তু চেহারার মধ্যে এমন একটা কমনীয়তা আছে যে মায়া

পড়ে যায় খুব সহজেই। মুখের স্নিগ্ধতা সৃষ্টি করে বাৎসল্যের। আর ঠিক এখানেই আপত্তি অর্পিতার। বৌভাতের দুদিন পরের কথা। বাগানের দিকের বারান্দায় পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসেছিল সুশান্ত আর অর্পিতা। একটু আগেই সন্ধ্যা নেমেছে। সবুজনগরের বাতাসে বেশ চাপা একটা সিরশিরানি ভাব। সুশান্তর গায়ে একটা পাতলা চাদর। অর্পিতা কিন্তু কিছু নেয়নি। মেয়েদের বোধহয় শীতবোধ একটু কমই। সদ্য পরিণয়ের আবেশ রয়েছে পুরোমাত্রায়। এসময় নতুন দম্পতির মধ্যে প্রচুর সাইলেণ্ট ইণ্টারএ্যাকশন হয়। যেটা অন্য কারোর চোখে পড়ে না। ধরতে পারে না ঘনিষ্ঠরাও। মা এখন পূজোর ঘরে। বাবা রোজকার মতো লাইব্রেরিতে। ভাই বোনরাও কেউ টিউশনিতে বা লাইব্রেরীতে। অর্পিতার কলেজ জীবনের কথা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল সুশান্ত। হঠাৎ অর্পিতাই বলে ওঠে। —শোন, তোমাদের এই মৌসুমীটাকে কিন্তু আমার মোটেই ভাল লাগে না। একেবারে চমকে যায় সুশান্ত।

—সেকি! মৌসুমীকে তোমার পছন্দ নয়? ও আবার কি করল।

—না। আমায় কিছু করেনি। আমায় আবাব কি করবে?

—তাহলে! একথা কেন বলছ?

—বলছি কেননা বড্ড গায়ে পড়া ভাব। মেজদা মেজদা করে একেবারে গলে পড়ছে। এটা একেবারেই পছন্দ করি না আমি।

—আরে! ও তো একটা বাচ্চা মেয়ে। খুব দুঃখী। জান ওর মা-বাবা কেউ নেই। মামার বাড়ীতে লাথি ঝাঁটা খেয়ে মানুষ হচ্ছিল। সুশান্ত বোঝাতে চেষ্টা করে অর্পিতাকে।

—তা এখানে এসে জুটল কি করে। কণ্ঠস্বরে বেশ ভালরকম শ্লেষ অর্পিতার। সুশান্ত লক্ষ্য করে না এটাই। একই ভাবে বলতে থাকে।

—আরে ওর মামা এখানে চ্যারিটেবিল ডিসপেনসারির ক্লাস ফোরথ স্টাফ। বাবাকে একদিন কথায় কথায় ভাগ্নির ওপর মামীর অত্যাচারের কথা বলছিল। শুনে বাবা ওকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে এসেছেন। আসলে মেয়েটা খুব ভাল, জান। পড়াশুনার বিষয়ে খুব আগ্রহ। মাঝে মাঝে আমি ওকে পড়াই।

—থাক! অত বিদ্যাদানে কাজ নেই। ফুঁসে ওঠে অর্পিতা। আমি বলছি ওর সঙ্গে আর একটা কথাও বলবে না, ব্যাস। এক ঝটকায় চেয়ার থেকে উঠে ভিতরে চলে যায়। অন্ধকারে একা স্থানুর মতো বসে থাকে সুশান্ত। নিজের

কানকেও যেন বিশ্বাস হয় না। অর্পিতা, রজনীগন্ধার মত স্নিগ্ধ তার জীবনসঙ্গিনী যে এমন হিসহিসে স্বরে কথা বলতে পারে একথা কল্পনার অতীত মনে হয় সুশান্তর। সেদিন রাতে অবশ্য অনেকটাই মিটে গিয়েছিল সে সবের। কিন্তু পুরো মিটেছিল কি? ফুলশয্যার রাতে অর্পিতার কথাটা এখন বার বার মনে পড়ে সুশান্তর। আবেগঘন মুহূর্তে অর্পিতার মুখ থেকে বের হয়ে এসেছিল—মনে রেখো। আজ থেকে তুমি আর তুমি নও। আমিও আর আমি নই। এখন থেকে আমরা দু'জন এক। দু'জন মিলিয়ে আমি। শুনে আনন্দের মাত্রায় আরো বেশী আশ্লেষ অনুভব করেছিল সুশান্ত। কিন্তু তার অর্থ যে আজ নতুন মাত্রায় ধরা দেবে তাতো আমি ভাবিনি। দু'জন মিলিয়ে শুধু আমি হয়ে যাব। আর এই আমি তোমার সমস্ত তুমি সত্ত্বাকে গ্রাস করে নেবে—এতো তারই ইঙ্গিত। হঠাৎ এক অজানা ভয়ে একেবারে কেঁপে উঠেছিল সুশান্ত। তার জীবনে এ কিসের সূচনা। সেদিন যে রাগিনীর আলাপ শুরু হয়েছিল আজ কি তার বিস্তারের সূচনা হয়েছে? সেদিন আগুনের ফুলকির দেখা দিয়েই বা মিলিয়ে গিয়েছিল আজ একেবারে তা দাবানলের মত জ্বলে উঠেছে। সকালে চায়ের কাপ হাতে বারান্দায় বসতেই মৌসুমী খুশী খুশী মুখে এসে উপস্থিত।

—মেজদা, তুমি যে অংকগুলো দেখিয়ে দিয়েছিলে, সেগুলোই আমাদের ক্লাসের পরীক্ষায় এসেছে। জান! আমি না পঞ্চাশের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ পেয়েছি। বলতে বলতে একেবারে কাছে চলে এসেছিল মৌসুমী। তারপর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল সুশান্তকে।

—আরে, থাক থাক! আরো ভাল নম্বর পেয়ে পাশ কর। মৌসুমীর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিল সুশান্ত। ঠিক তখনই পাশের দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছিল অর্পিতা। স্নান সেরে আসায় ভিজে চুলগুলো কিছুটা চেপে আছে। সকালে সিঁদুরের টিপ আর পাটভাঙ্গা শাড়িতে এক সুন্দর সুগন্ধ। কিন্তু চোখের দিকে তাকাতেই অস্বস্তিতে কেঁপে ওঠে সুশান্ত। অর্পিতার চোখে রীতিমতো আগুন। একদৃষ্টে তাকিয়ে মৌসুমীর দিকে। মৌসুমী অবশ্য লক্ষ্য করেনি। খালি চায়ের কাপ হাতে সোজা চলে গেছে রান্নাঘরের দিকে।

—বাঃ, বাঃ, ভালই শুরু হয়েছে। লীলাখেলা বেশ চলছে। কি বল! বেশ জোরেই বলে ওঠে অর্পিতা।

—শুনুক, সবাই শুনুক। তোমার কু-কীর্তির কথা তোমার বাবা-মারও জানা

উচিত। অর্পিতার গলায় আগুন ঝরছে। আশীর্বাদের নাম করে বেশ গায়ে মাথায় হাত দেওয়া যায় তাই না। এক ঝটকা মেরে অর্পিতা চলে গিয়েছিল ভিতরের ঘরে।

বজ্রাহতের মত বসেছিল সুশান্ত। অনেকক্ষণ—বহুক্ষণ ধরে। সপ্তাহের প্রথমদিন। অফিসের কথা কাজের কথা সব ভুলে গিয়েছিল। ভাই-বোনেরা সবাই ঘুমাচ্ছে। ওরা অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করে। বাবা শুনতে পেয়েছেন কিনা কে জানে? আরো কিছুক্ষণ বসে থেকে তারপর উঠে পড়ে সুশান্ত। আজ আর অফিস যাবে না। প্যাণ্ট শার্ট গলিয়ে নিয়ে সোজা বেরিয়ে পড়ে বাড়ী থেকে। এদিক ওদিক উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরতে থাকে। সবুজ নগরের শেষ প্রান্তের রাস্তা দিয়েই ঘুরে চলে সে। যাতে পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা না হয়ে যায়। দেখা হলেই তো নানারকম কথা এসে যাবে। নতুন জীবন কেমন কাটছে। আজ অফিস যাওনি কেন? ছুটিতে আছ নাকি? ক'দিনের ছুটি নিয়েছ? এসব প্রসঙ্গের মুখোমুখি হওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই ওর। দুপুর হতে অনেক বাকি। কোনরকম ক্ষিদেও অনুভব করে না সুশান্ত। অথচ সকালে এক কাপ চা ছাড়া আর কিছুই খায়নি সে। সঙ্গে প্রথম সিগারেটটা। তারপর থেকে খালের ধারে বসে থাকতে থাকতে শেষ হয়ে গেছে ছয়টা সিগারেট। সময় স্থির। এখন পাক খাচ্ছে শুধু ওকে ঘিরে।

এতক্ষণ ধরে যে ঘটনার কথা বললাম তা আমার নিজের চোখে দেখা। যে দম্পতির জীবন নিয়ে এই লেখা তারা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই আমার পরিচিত। আজ আর বেঁচে নেই দু'জনের একজনও। কালের অমোঘ গতিতে দু'জনেই বিদায় নিয়েছে ধরাধাম থেকে। কিন্তু বেঁচে আছে তাদের বংশধরেরা। তারা আজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত নাম পরিচয় জানালে তারা একান্ত বিব্রত হবে। নানামহলে উঠবে নানা কথা। কাজেই প্রয়োজনের খাতিরেই আমাকে বদলে দিতে হয়েছে এ গল্পের চরিত্র ও কিছু কিছু ঘটনার গতিকে। প্রশ্ন উঠতেই পারে এ কাহিনী লিপিবদ্ধ করার এমনকি প্রয়োজন হয়েছিল। আমার কথায় মানব-মানবীর চিরায়ত সম্পর্কের একটি অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ-বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ হওয়া একটা শাশ্বত সত্য। শাস্ত্রে বলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নাকি জন্ম জন্মান্তরের। বিধাতাপুরুষ না-কি আগেই ঠিক করেন এ পৃথিবীতে কারা স্বামী-স্ত্রী রূপে বিবাহবন্ধনে বাঁধা পড়বে। এর পরে অর্থাৎ নবজীবনে প্রবেশের পর দু'জনের মধ্যে প্রেম স্বাভাবিক। ধীরে ধীরে নানারকম অভিজ্ঞতা এবং ঘাত-

প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে তা ক্রমেই হয়ে উঠতে থাকে দৃঢ়। বিশ্বাস আর ভালবাসার এই বিচিত্র সম্পর্ককে প্রাজ্ঞজনেরা বহুবার বহুরকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনার প্রয়োজন আমি অনুভব করি না। কারণ তা শুধু পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই হবে না। আমি শুধু বলতে চাই যে ভালবাসার অস্বাভাবিক বাড়াবাড়িটাও দাম্পত্য সম্পর্কের পক্ষে মোটেই ভাল না। স্বামী বা স্ত্রী যদি এই রোগের শিকার হয় তাহলে অপরপক্ষের আর দুর্গতির সীমা থাকে না। আর এই বিষয়ে পুনরাবৃত্তি যদি চলতে থাকে তবে মালার বন্ধন এক গলার ফাঁসের মত চেপে বসে। ফলে করুণ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া কিছু আর বাকি থাকে না। শরৎচন্দ্রের ভাষায় "প্রকৃত প্রেম শুধু কাছেই টানেনা, দূরেও সরাইয়া দেয়"—একথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু দাম্পত্য প্রেমের পোসেসিভনেস্ যদি ক্রমশই ঊর্ধ্বগামী হতে থাকে তাহলে পরিণাম কি হতে পারে, সে প্রসঙ্গেই এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন মনে হয়েছে আমার।

সুশান্তর বাবা অচিন্ত্য মুখার্জী এই কদিনেই পুত্রবধুকে খুব ভালবেসে ফেলেছেন। এত লক্ষ্মীমন্ত স্বভাব। এত মধুরভাষিণী বধূ এরমধ্যেই জায়গা করে নিয়েছে একেবারে তার হৃদয়ে। মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন তিনি। ভাবেন পূর্বজন্মের হয়তো অনেক পুণ্যের ফল এবং ঠাকুরের অশেষ কৃপা বর্ষিত হয়েছে তাঁর ওপব। ছেলেমেয়েরাও নতুন বৌদিকে পেয়ে ভীষণ খুশি। কার কি দরকার, কখন কার কোন জিনিষটা প্রয়োজন তা এ কদিনেই অপির্তার নখদর্পণে। রাত থাকতেই বিছানা ছাড়ে সে। শ্বশুরমশাই খুব ভোরে ওঠেন। সকাল ছ'টার মধ্যেই তাঁর চায়ের প্রয়োজন। এর আগে অচিন্ত্যবাবু নিজেই করে নিতেন সকালের প্রথম চা-টা। স্ত্রীকেও জাগাতেন না। কিন্তু অর্পিতা আসার পরে পাল্টে গেছে সব। সকালের চায়ের কাপ হাতে সে ঠিক হাজির হয়ে যায়। —বাবা! আপনার চা এনেছি। প্রথম প্রথম অনুযোগ করতেন অচিন্ত্য। কিন্তু অর্পিতা শুনত না। —আপনার জন্য চা নিয়ে আসতে আমার ভাল লাগে, বাবা। একথা শুনে আর আপত্তি করতেন না অচিন্ত্য। অর্পিতাকে দেখে এক ঝলক মনে পড়ে যেত তার মায়ের কথা। ওপার বাংলা থেকে আসার পর এই সবুজনগরে বসবাস, এখানে তৈরী করা বাসস্থানের স্মৃতি যেন ছায়াছবির ফ্ল্যাশব্যাকের মত ভীড় করে আসত তাঁর মনে। তখনও তাঁর সবুজনগর সম্পর্কে কোন ধারণা তৈরী হয়নি। অফিসের এক বন্ধুর মুখে শুনেছিলেন যে এখানে খুব সস্তায় জমি পাওয়া যাচ্ছে। সুবল বসু

বয়সে তাঁর থেকে একটু ছোট হলেও দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে সেটা কোন বাধা হয়নি। সুবল বারবার বলতো। বুঝলে দাদা, যত তাড়াতাড়ি পারি এখানে একটা জমি কিনতেই হবে। এদেশে আমাদের একটা ভিত চাই। তা নাহলে নিজের জোর বলে কিছু থাকবে না। সুবলের মত এত উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন না অচিন্ত্য। তবু এর মধ্যে একদিন প্রায় জোর করে অফিস ছুটি করাল সুবল। নিয়ে গেল জমি দেখতে। ট্রেন থেকে বাস হয়ে তারপর রিকশায় আসতে আসতে একেবারেই দমে যাচ্ছিলেন অচিন্ত্য। তারপরে নিস্তেজ হয়ে গেলেন জমি দেখে। এতো এক বিশাল মাঠ। রূপকথার তেপান্তরের মাঠের মত। যেদিকেই তাকানো যাক খুঁজে পাওয়া যায় না কোন কিনারা। দূরে—বহু দূরে একঝলক দেখতে পাওয়া যায় রেললাইন। ফাঁকা এই ভূখণ্ডে দু-একটা বাড়ী চোখে পড়ে। মনে মনে হিসাব করেন অচিন্ত্য। জায়গাটা প্রায় কয়েক হাজার একর হবে। মধ্যে মধ্যে কিছু জলা জমিও আছে। এর মধ্যে বাড়ী করতে পারলেও থাকব কেমন করে? সুবলকে জানাতেই সে ফুৎকারে উড়িয়ে দেয় সব দ্বিধা। —আরে দাদা। তুমি চোখে দেখে বুঝবে না। সব জমিই কিন্তু প্রায় বিক্রি হয়ে গেছে। এস, আমার সঙ্গে এস। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের দিকে সুবল নিয়ে যায় অচিন্ত্যকে।—এই দেখ। এই জমির আটটা প্লট খালি বাকি আছে। আমি তোমাকে বলছি শোন। এই দশ কাঠা জমি তুমি নিয়ে নাও।

—দশ কাঠা! এত টাকা আমি পাব কোথায়? আপত্তি জানিয়েছিলেন অচিন্ত্য।

সুবল কথা মানেনি। এমন পাখীপড়া করেছিল যে অচিন্ত্যর আপত্তি ধোপে টেকেনি। নিজের সব সঞ্চয় মিলিয়ে কম পড়ছিল প্রায় তিন হাজার। সুবলকে বলতেই সে বলে—তুমি চিন্তা করো না দাদা। ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। পরদিন অফিসে আসেনি সুবল। নানা কথা ভাবছিলেন অচিন্ত্য। কি হল? সুবল অফিস কামাই করার মত ছেলে তো নয়। তার পরের দিন সকালেই অবাক কাণ্ড। টালিগঞ্জের দেশবন্ধু নগরের বাড়িতে তখনো সকাল হয়নি। দরজা খুলে সামনের মাঠের দিকে এগোতেই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন অচিন্ত্য। ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে আসছে সুবল। কাছে এসেই হাত চেপে ধরেছিল তার।—রাত তিনটেয় বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। কত তাড়াতাড়ি চলে এলাম দেখলে। বিস্ময়ের জোয়ারে তখন প্রায় হাবুডুবু খাওয়ার অবস্থা অচিন্ত্যর।—ব্যাপারটা কি? হঠাৎ তুমি

এভাবে এলে কি করে? এস এস! বাড়ীতে এস। —না, না। এখনও কেউ বাড়ীতে ওঠেনি। এই তো সাড়ে পাঁচটা বাজে। কি তাইতো? জিজ্ঞাসা করেছিল সুবল।

অচিন্ত্য—কিন্তু আগে বসবে তো। এতদূর থেকে এসেছো।

সুবল—তোমাদের এখানে কোন চায়ের দোকানটা সবচেয়ে আগে খোলে। চল সেদিকেই যাই।

—চায়ের দোকান? ও, হ্যাঁ তা অবশ্য খোলে। ডানদিকে মোড়ের দোকানটাই তো সবচেয়ে ভোরে খুলে যায়। চল তাহলে। সুবলের সঙ্গে গিয়ে দুটো চায়ের অর্ডার দেন অচিন্ত্য। এর পরেই হঠাৎ পকেট থেকে একটা মোটা প্যাকেট বার করে সুবল।—এই নাও। এটা রাখ। —কি এটা! অচিন্ত্য জিজ্ঞাসা করেন। —তোমার তো তিন হাজারের মত কম পড়ছিল।

—হ্যাঁ, কিন্তু তার সঙ্গে এটা......

—আরে শোন না। কাল সারাদিন অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোথাও কিছু ব্যবস্থা করতে পারলাম না। তাই আর অপেক্ষা করলাম না। বিয়ের আংটিটা বেশ ভারী ছিল, বুঝলে। ওটাকে বিক্রি করে দিলাম।

—সে কি! একেবারে হতবাক হয়ে যান অচিন্ত্য। বিয়ের আংটি তুমি বিক্রি করেছ। না না, এটা তুমি ঠিক করনি সুবল। এ টাকা দিয়ে আমি....

কথাটা শেষ করতে দেয় নি সুবল। বলেছিল, সোনা আঁকড়ে রেখে কি ধুয়ে ধুয়ে জল খাব। পাশাপাশি তোমার আমার বাড়ী থাকবে। এর থেকে দামী জিনিষ আমার কাছে আর কিছু নেই। এরপর দ্রুতলয়ে ঘটেছিল সব। জমি রেজিষ্ট্রি হল। নানা ভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যবস্থা হয়ে গেল টাকারও। বাড়ী তৈরী হয়ে গেল। সবুজনগরের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেল মুখার্জী আর বসু পরিবার। গৃহপ্রবেশের দিন আর চোখের জল রাখতে পারেননি অচিন্ত্য। সুবলকে জড়িয়ে ধরেছিলে বহুক্ষণ। চোখের জল ঝরে পড়েছিল নীরবে। বিব্রত হয়েছিল সুবল।—একি! তুমি কাঁদছো কেন দাদা। আজ তো আনন্দের দিন। আজ আমাদের এদেশের স্থায়ী আইডেনটিটি হয়ে গেল। তোমার কাছে আর কিছু বলে তোমায় ছোট করব না সুবল। আজকের দিনে এই উপকার রক্তের সম্পর্কের মানুষও করে না। সুবল একদম উড়িয়ে দিয়েছিল।—আরে আমার বড়দা

অনেকটা তোমারই মত দেখতে ছিল, বুঝলে। ছাড় এসব কথা। আমাদের দুভাই-এর নিজস্ব আস্তানা এদেশে হয়ে গেল বুঝলে। এর থেকে সুখের আর কিছু থাকতে পারে না।

ছায়াছবি পর্দায় দ্রুতলয়ে ঘটে যাওয়া ঘটনার মত কখনও কখনও এসব উঁকি দিয়ে যায় অচিন্ত্যর। এরপর কতদিন কেটে গেছে। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। সুশান্ত এখন কেন্দ্রীয় সরকারী অফিসে কর্মরত। বড় সাধ করে ওর বিয়ে দিয়েছেন অচিন্ত্য। বৌমার বাপের বাড়ীর লোকেরাও ভাল। তাঁরাও পূর্ববঙ্গেরই মানুষ। সংসারের বড়বৌ-এর আসনে অর্পিতার জায়গাটা আরো পাকা হোক অচিন্ত্য সবসময় এই কামনাই করেন। তিনি ঘুণাক্ষরেও টের পাননি। ছেলের বিবাহিত জীবনে ধীরে ধীরে উঁকি দিচ্ছে কিসের ছায়া।

কাল সন্ধ্যায় জেনারেল ম্যানেজারের ফেয়ার ওয়েল ছিল। চৌত্রিশ বছরের কর্মজীবন শেষ করে অবসর নিলেন সুপ্রতিম চৌধুরী। বিরাট পার্টির আয়োজন হলেও মন কিছুটা খারাপই লেগেছিল সুশান্তর। বহু ওপরতলার মানুষ হলেও অহংকারের লেশমাত্র ছিল না চৌধুরী সাহেবের মধ্যে। এ্যাসিস্টেন্ট পারসোনাল অফিসার হলেও তাকে বিশেষভাবে স্নেহ করত চৌধুরী। অনেক কাজ নিজের হাতে শিখিয়ে দিয়েছেন। গাড়ীতে তুলে দেওয়ার সময় সুশান্তর কাঁধে হাত দিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, ডোণ্ড গেট আপসেট মাই বয়। মন দিয়ে কাজ কর। কোন অসুবিধা হলে সোজা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। ফেয়ারওয়েলের অনারে আজ ছুটি। কথাটা শুনেই খুশি হয় অর্পিতা। চল, আজ তাহলে ছোট মাসীর বাড়ীতে ঘুরে আসি। সেই যে বিয়ের পরেই গিয়েছিলাম। অর্পিতার ছোটমাসীকে বেশ ভালই লেগেছে সুশান্তর। খুব স্নেহপ্রবণ। চেহারার মধ্যে একটা মাতৃভাব যেন ছড়িয়ে আছে। একটু বেলা করেই বের হবে দু'জনে। কাগজের পাতায় ডুবেছিল সুশান্ত। ভিতরে অর্পিতা কাজ সারতে ব্যস্ত। হঠাৎ একটা এ্যামবাসাডার এসে দাঁড়িয়ে যায় বাড়ীর সামনে। মুখ তুলেই অবাক হয় সুশান্ত। আরে, এটাতো আমাদের অফিসের গাড়ী। ব্যস্ত পায়ে গাড়ী থেকে নেমে সামনে এগিয়ে আসে শিউপূজন। কাছে এসে বলে, স্যার! একটা আরজেন্ট ম্যাসেজ আছে। সাহেব আপনাকে এই চিঠিটা দিয়ে পাঠিয়েছেন। চিঠি খুলে দেখে সুশান্ত। পারসোনাল ডিপার্টমেণ্টের একটা প্রবলেম নিয়ে মামলা হয়েছে লেবার ট্রাইবুনালে। আজই বেলা দুটোর সময় হিয়ারিং। চিফ পারসোনাল

ম্যানেজার অসুস্থ থাকায় তাকেই এ্যাপিয়ার করতে বলেছেন সি. জি. এম.। এক মুহূর্ত চিন্তা করে সুশান্ত। এই ডিপার্টমেণ্টে কাজ করার সুবাদে এই মামলার বিষয়ে ওয়াকিবহাল সে।—তুমি দশ মিনিট দাঁড়াও। এখুনি আমি আসছি। ভিতরে গিয়েই মাকে বলে—অফিস থেকে গাড়ী এসেছে মা। একটা মামলার ব্যাপারে আমাকে যেতে হবে।

—সে কি রে! অবাক হয়ে যান প্রভা। আজ তো ছুটি বলেছিলি; তবে আজ আবার .....

—কি করবো বল। বড় সাহেব নিজে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছেন।

—কিন্তু বৌমা যে প্রায় তৈরী হয়ে গেছে।

—ওসব ছেড়ে দিন মা। ওর কাছে অফিসই সব। ছোট মাসীকে জানানো হয়ে গেছে। কি মনে করবে বলুন তো! অর্পিতার গলায় কান্না আর রাগের স্বর। —শোন অর্পিতা। একটু বোঝার চেষ্টা কর। এটা একটা সিরিয়াস ম্যাটার। না গেলে আমার চাকরীর ওপর একটা খারাপ এফেক্ট হবে না? অসহায় হয়ে পড়ে সুশান্ত। তারপর করুণভাবে বাবার দিকে তাকায়।

—এ ব্যাপারে কিছু করার নেই বৌমা। স্বয়ং বড়সাহেবের বিষয়। নাণ্টুর ওপর ভরসা করেন বলেই তো ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন। অচিন্ত্য বলে ওঠেন। তুই আর দেরী করিস না। বেরিয়ে পড়। তাড়াতাড়ি ফেরার চেষ্টা করিস। গাড়ীর দরজা বন্ধ করার সময় পিছন দরজার দিকে তাকায় সুশান্ত, না, যাকে চাইছিল তাকে ধারে কাছেও দেখা যাচ্ছে না। গর্জন করে সামনের দিকে এগিয়ে চলে যন্ত্রযান। সবুজনগরের জনপদকে পিছনে ফেলে। সেদিন বাড়ী ফিরে সব শুনেছিল সুশান্ত। ওর অফিসের গাড়ী চলে যাওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যে বাপের বাড়ী চলে গিয়েছিল অর্পিতা। শ্বশুর শাশুড়ী অনেক বারণ করেছিলেন। দেওর ননদরাও আটকাতে চেষ্টা করেছিল বৌদিকে। কিন্তু সে শোনেনি কারোর কথা। এসব কথা জেনে খুব বিব্রত বোধ করেছিল সুশান্ত। প্রভা বলেছিলেন, যাইহোক। কতই বা বয়স ওর। একেবারেই তো ছেলেমানুষ। তুই কালই চলে যা। ওকে বুঝিয়ে বল। বাড়ীতে নিয়ে আয়।

—তোর মা ঠিকই বলেছে নাণ্টু। সত্যিই তো! ঠিক করা প্রোগ্রাম। এভাবে নষ্ট হয়ে গেলে অভিমান তো হতেই পারে। অচিন্তও সায় দিয়েছিলেন। লজ্জা সংকোচে ভাইবোনদের দিকে তাকাতে পারেনি সুশান্ত।

সেদিন সারারাত ঘুম হয়নি সুশান্তর। মাঝে মাঝে হালকা তন্দ্রা মত এসেছে। আবার একটা ঝটকা খেয়ে ঘুম ভেঙ্গে গেছে। বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে করতে মনের মধ্যে এসেছে এলোমেলো নানা চিন্তাভাবনা। এতদিনে একটা অভ্যাস তৈরী হয়ে গিয়েছিল। রাতে পাশাপাশি শুয়ে অনেকক্ষণ গল্প করত দু'জনে। কথা হত বহুরকম স্বপ্নের। ভবিষ্যতের পরিকল্পনার সার্থকরূপ কিভাবে দেওয়া হবে সে প্রচুর জল্পনা-কল্পনাও চলত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। বিছানায় শুয়ে খুব মৃদুস্বরে দেয়ালঘড়ির ঘণ্টায় রাত তিনটে বাজার সময় বুঝতে পারে সুশান্ত। এরপরে ধীরে ধীরে নেমে আসতে থাকে ঘুম। গাঢ় ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিল সুশান্ত। নিদ্রা মানুষের সব সন্তাপ ভুলিয়ে দেয়। কিছুক্ষণের জন্য মুছে দেয় সব উদ্বিগ্নতা আর সংশয়কে। ঢং ঢং শব্দে সাতটার ঘণ্টা বাজতেই চমকে জেগে ওঠে সুশান্ত। বিছানায় উঠে বসতেই ঘরে ঢোকেন প্রভা। মুখ হাত ধুয়ে নে খোকা। আমার চা হয়ে গেছে। একটু পরে কাপে চুমুক দিতে নিজেও চায়ের গ্লাস হাতে পাশে এসে বসেন প্রভা। ছেলের পিঠে হাত রেখে বলেন, কাল সারারাত ঘুম হয়নি তো। মায়ের দিকে তাকায় সুশান্ত।—তুমি কি করে বুঝলে? মৃদু হাসেন প্রভা ছেলের কোন অসুবিধা হলে আর কেউ না জানলেও মা ঠিক টের পায়। ঠিকই টের পায়। —আসলে কি জান! কাল বারবার ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছিল। অথচ দেখ সারাদিন কত পরিশ্রম গেছে। —জানি বাবা। মনের মধ্যে চঞ্চলতা থাকলে হাজার পরিশ্রমেও ঘুম আসতে চায় না। গলা ঝেড়ে মায়ের দিকে ঘুরে বসে সুশান্ত। —মা, আজ তাহলে অর্পিতাদের বাড়ী—

—হ্যাঁ বাবা। তুই সকালেই চলে যা। বেশী দূর তো নয়। নে! আর দেরী করিস না। জলখাবার খেয়েই বেরিয়ে পড়। আর শোন, কোনরকম ঝগড়া অশান্তি করিস না। ভালভাবে বুঝিয়ে ওকে নিয়ে আসবি।

সে দিন সেটাই হয়েছে। অর্পিতাদের বাড়ী যেতেই সাদর উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছিল সুশান্ত। শাশুড়ী এসে হাত ধরে ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন। শালাশালিরা ওকে ঘিরে বসেছিল। বড় শালি অপর্ণা প্রায় সুশান্তর সমবয়সী। সম্পর্কে বড় হলেও 'পদমর্যাদা' ভুলে সে এসেই ধরেছিল সুশান্তর কান।—গা থেকে এখনও গন্ধ যায়নি এর মধ্যেই ঝগড়া। কথাটা শুনে অর্পিতার ভাই-বোনেরা হইহই করে উঠতেই কড়া ভাষায় ধমকে উঠেছিল অপর্ণা। এই! তোরা সবাই সম্পর্কে ছোট। এ ঘর থেকে যাতো। সুশান্তর সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে। বড়দির ধমক খেয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলে গিয়েছিল সবাই। এর পরে চাপাস্বরে সুশান্তকে

বলেছিল অপর্ণা।— শোন ভাই। অর্পিতা আমাদের একটু অভিমানী। আমি জানি এটা সামান্য ব্যাপার। এনিয়ে রাগ করে চলে আসাটা কোন কাজের কথাই নয়। তুমি ওকে নিয়ে যাও। একটু মানিয়ে নিও। এখন তুমিই তো ওর সব—তাই না। হেসে ফেলেছিল সুশান্ত।—আমি জানি দিদি। আমি দেখব—মানে চেষ্টা করবো। যতটা হয় মানিয়ে নেবার।

সে দিন খুব সহজেই মিটে যায় সবকিছু। কিন্তু মেটেনা বরাবরের মত। দিন যত কেটেছে বয়স যত বেড়েছে, ততই বেড়েছে অর্পিতার এই অদ্ভুত বাতিক। বহুবার বুঝিয়েছে সুশান্ত। এ অকারণ সন্দেহের বিষ কিভাবে নষ্ট করে দেয় সংসারকে। তা নিয়ে অনেকবার আরো ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনা করেছি। খুব সাবধানেই বেছে বেছে বসতে হয়েছে আলোচনায়। এ কথা তো যাকে তাকে বলা চলে না। ঠাট্টা-তামাসার বিষয় খুঁজে পেলে লোকের তো আহ্লাদে খাওয়া ঘুম বন্ধ হয়ে যায়। সরস চাটনিমাখন এই আলোচনা শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হতে হতে একেবারে ভিন্ন আকার ধারণ করে। একথা অজানা ছিল না সুশান্তর। তাই এবিষয়ে খুব সন্তর্পণে হাঁটতো সে। এক ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছিলেন আপনার মিসেসকে কোন কাজে এনগেজ করে রাখুন। সুশান্তর মনে কিন্তু একটা দ্বিধা কাজ করেছিল। কিন্তু ডাক্তারবাবু, আমাদের সংসারের সব কাজ তো আমার স্ত্রী নিজেই করে। মানে ও আসার পর থেকে ম্যাক্সিমাম কাজের ভার নিজেই মাথায় তুলে নিয়েছে।

চোখ থেকে চশমাটা খুলে হাতে নেন ডাক্তার ব্যানার্জী। একটু হেসে বলেন, লোকে আমাকে কি বলে জানেন? হঠাৎ এই কথায় চমকে যায় সুশান্ত।—আপনাকে? লোকে কি মানে....

ডাক্তার অর্ণব ব্যানার্জীকে দু'রকম ভাবে লোকে জাজ করে, বুঝলেন। একদল লোক মানে আমার পেশেন্টের মধ্যে বেশী অর্থাৎ বেশীরভাগ মানুষ আমাকে ত্রাতা মনে করে। আর মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভগুলো কি বলে জানেন? হাড়বজ্জাত, পাকা শয়তান এইসব আর কি! চোখের পাতা পড়ে না সুশান্তর। ডাক্তাববাবুর এই মুডের সঙ্গে একেবারেই অপরিচিত সে। অর্ণব তার বন্ধু অদ্রির দাদা। এটা অবশ্য আগে জানত না সুশান্ত। অর্পিতার ব্যাপারে এক ডাক্তারের খোঁজ করতে গিয়েই অর্ণবের কথা জানতে পেরেছিল সে। কিন্তু অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও কিছুতেই নিজেকে 'তুমি' বলাতে পারেনি। অর্ণব বলেছেন ছাত্রজীবনে রামকৃষ্ণ মিশন হোস্টেল থেকে পড়াশুনা করেছিলেন তিনি। সেখানকার মহাবাজের

দেখাদেখি 'আপনি' বলার অভ্যাসটা চারিয়ে গেছে তাঁর মধ্যে। —বুঝলেন সুশান্ত, এটাও প্রেমেরই আরেক অভিব্যক্তি। ডাক্তার ঝুঁকে আসেন সামনের দিকে। আপনার মিসেস অত্যন্ত বেশী ভালবাসেন আপনাকে। মেইনলি আপনাকে হারানোর একটা অকারণ ভয় বেশীর ভাগ সময় কাজ করে আপনার মিসেসের মনে। তাই ওর মনে সবসময় একটা সাইকোলজিক্যাল ডিপ্রেশান কাজ করে। তাই এমন কিছু কাজের মধ্যে ওকে ডুবিয়ে রাখা দরকার যে নিজস্ব সময় বলতে আর বিশেষ কিছু থাকবে না। অর্থাৎ আপনাকে বেশীক্ষণ সামনেই পাবে না, এই আর কি! চেম্বার থেকে বাড়ী আসার পথে সে কথাই চিন্তা করছিল সুশান্ত। হঠাৎই একসময় ভাবনাটা খেলা করে যায় মাথার মধ্যে। অর্পিতার পড়াশুনার ব্যাপারটা যদি আবার শুরু করা যায়। ও তো হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ। এটাই ঠিক হবে। সুশান্ত ডিসিশান নিয়ে নেয়। অর্পিতা ছাত্রী হিসাবে খারাপ নয়। বইপত্র পড়ার দিকে আগ্রহও আছে। এটা দেখেছে সুশান্ত। আশাকরি ওর খুব একটা আপত্তি হবে না।

সব চিন্তাভাবনাই ভুল প্রমাণিত হয়। অর্পিতা একেবারেই রাজী নয়। অচিন্ত্যবাবুও, এ ব্যাপারে নিরাশ সে।

—না বাবা! আমার দেওর ননদরা লেখাপড়া করছে। এছাড়া আপনাদের দু'জনকেও দেখাশোনার আছে। এর মধ্যে আমি যদি আবার পড়া শুরু করি তাহলে কি করে চলবে। সুশান্ত বোঝাতে চেষ্টা করে।—আরে ভাই বোনরা সবাই বড় হয়ে গেছে। এখন ওদের ব্যাপারটা ওরা নিজেরাই হ্যাণ্ডেল করা ভাল নয় কি? আর তুমি যদি পড়াটা আরম্ভ কর তাহলে তো ওদের সুবিধাই হবে। তুমি কি বল মা? প্রভাকে প্রশ্ন করে সুশান্ত। প্রভাও সমর্থন করেন।—নান্টু ঠিকই বলছে বৌমা। আজকের দিনে মেয়েদের আরো বেশি করে উচ্চশিক্ষা নেওয়া উচিত। এই দ্যাখো না, আমার বিয়েও তো পড়তে পড়তেই হয়েছিল। সংসারের চাপে বহুদিন বইপত্রের অভ্যাসটাই চলে গেছে। এখন তো বুঝতে পারি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কতখানি জরুরি। অবাক চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে ছিল সুশান্ত। মাকে এতদিন শুধু সংসারের চালিকাশক্তি হিসাবেই দেখে এসেছে সে। প্রভার মধ্যে চিন্তাভাবনার গভীরতা দেখে মনে নতুন করে শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না।— আচ্ছা এ নিয়ে পরে ভাবা যাবে।

মা, চলুন রান্নার দিকটা দেখি। আজ ছুটির দিনে একটা স্পেশাল মেনু করবো ঠিক করেছি। আলোচনাটা কোনরকম সঠিক সিদ্ধান্তে আর দাঁড়ায় না সেদিন।

সেদিন কেন, দাঁড়ায়নি আর কোনদিনই। দিন থেকে চলে মাস। মাস থেকে চলে যেতে থাকে বছরের, বহু বিবর্তন ঘটে গেছে। সামাজিক প্রেক্ষাপট বদল হয়েছে। বলা যায় ওলোট পালট ঘটে গেছে চারপাশের। মূল্যবোধের ইতিহাস আজ নতুন করে লেখা হচ্ছে। নয়া সমাজের সদস্যরা চোখে আঙুল দিয়ে সনাতনীদের একটা কথাই বোঝাতেই চাইছে। তোমরা এখনও পুরোপুরি বাতিলের দলে না হলেও এগিয়ে আছ সেদিকেই। এখন আমাদের জমানা। আমরা যে ভাবে চলবো, সেভাবেই ছুটবে দুনিয়া। তোমাদের পরিবারতন্ত্রের বস্তাপচা স্লোগান এখন অচল। এখনকার নয়ামুখের মিছিল থেকে যে কলরোল বেরিয়ে আসবে—সেটাই 'আজ'। তোমাদের 'কাল' মৃত। শুধু দয়া করে তোমাদের মুমূর্ষু হিসাবে দেখছি আমরা। পাঠিয়ে দিইনি চিরনির্বাসনে। তবে সময় যে দিন সে কথা বলবে, গ্রেভ ইয়ার্ডে পাঠিয়ে দিতে আর কসুর করব না তোমাদের। কেবল ঝিলের মধ্যে জল একেবারে স্থির। এক অদৃশ্য প্রবাল রাজ্য সেখানকার নিয়ন্তা। বাইরের ঝড় শুধু আঘাত করে। চেষ্টা করে একে ভেঙ্গে দিতে। কিন্তু পারে না। পরাস্ত সৈনিকের মত মাথা নীচু করে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালায়। আজকাল নিজের জীবনকে এমনই মনে হয় সুশান্তর। সকলেই নিজের কাজে ব্যস্ত হওয়ায় এখানকার নিয়ম অনুযায়ী পারিবারিক মেলামেশাটা এখন গেট টুগেদারেই সীমাবদ্ধ। কথায় বলে স্বামী-স্ত্রীর সত্যিকারের সম্পর্ক বোঝা যায় পঞ্চাশের পর থেকে। সম্পর্কের বুনিয়াদ ততদিনে হয়ে যায় অনেক পাকা। তুচ্ছ রাগ অভিমান অনুযোগের যে পালাগুলোকে এত দিন খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হতো বয়সের পরিপক্কতায় তাদের এ সময় বড়ই তুচ্ছ মনে হয়। শুধু একটি কাঁটা সব গোলাপের মধ্যে থেকেও খোঁচা দিচ্ছে বারবার। অর্পিতার কমপ্লেক্স। সোসাইটিতে হাসাহাসি, চাপা কানাকানি, বুড়ির বুড়ো বয়সে ভীমরতি-এর কোনটাই টলাতে পারে না তাকে। এখনও সে নিজের ধারণায় অবিচল। কোন মেয়ে বা মহিলার সঙ্গে হেসে এমনকি শুধুমাত্র কথা বললেও শুরু হয় তুলকালাম। এত সন্দেহ নিয়ে মানুষ কি করে বাঁচে এটাই বুঝতে পারে না সুশান্ত। এমনকি নিজেব মেয়ের বন্ধু কেউ যদি বাড়িতে আসে. তাহলেও মুশকিল। সোনাই-এর পড়ার ঘরে বসলেও শ্যেণ দৃষ্টি অনুসরণ করে চলে তাদের। আদর আপ্যায়নে অবশ্য কোনরকম ত্রুটি হয় না। তাদের প্রতি আদর যত্নে কোন খাদ নেই অর্পিতার। মেয়ের বন্ধুরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাদের কাকিমা বা মাসির। তোমার মত কেয়ারিং সত্যিই আমি কাউকে দেখিনি। আমার মাও দৃষ্টি রাখে। কিন্তু তোমার

মত সবদিক এমন ভাবে দেখা—সত্যিই ভাবা যায় না। ডোরা সোনাই এর বন্ধু। ওর সঙ্গে একই ক্লাসে পড়ে। স্বভাবে অবশ্য একেবারে বিপরীত। সোনাই একেবারে শান্ত প্রকৃতির। ধীর স্থির ও কিছুটা আত্মসমাহিত। ওর মায়ের অবশ্য এটাই পছন্দ। মেয়েরা একটু মেয়েলি প্রকৃতি হওয়াই ভাল। বলতো অর্পিতা। সবসময় লাফালাফি আর হৈ হৈ একদম ভাল লাগে না আমার। আশ্চর্যের ব্যাপার ডোরার প্রতি কোনরকম অভিযোগ ছিল না তার। আসলে বাড়ীতে ঢুকেই 'কাকিমা' বলে এমনভাবে জড়িয়ে ধরত অর্পিতাকে যে সে একেবারে স্নেহে গলে যেত।—কাকি, ভীষণ—সাংঘাতিক ক্ষিদে পেয়েছে। তাড়াতাড়ি কর। না হলে কিন্তু চেয়ার টেবিল খেতে আরম্ভ করবো বলে দিচ্ছি। একঝলক দমকা হাওয়ার মত যেন ডোরা।

—আরে দাঁড়া, দাঁড়া। আগে হাত মুখ ধো, এক্ষুনি খেতে দিচ্ছি।

অর্পিতার ব্যবহার দেখে অবাক হয়ে যেত সুশান্ত। লঘু আচরণ, উচ্ছলতাকে একেবারেই প্রশ্রয় দেবার পাত্রী নয় অর্পিতা। তবে ডোরাকে এমন ভাবে এত সহজভাবে নেয় কি করে। একথাটা অনেকবার জিজ্ঞাসা করবে ভেবেছে কিন্তু অশান্তির আশঙ্কায় পারেনি। যদি অন্য কিছু ভেবে বসে অর্পিতা। যদি বলে বসে, কেন! মেয়ের বন্ধুকে বেশ মনে ধরেছে বুঝি। মনের ভেতর তোলপাড় করে সুশান্তর। এভাবে সবসময় আশঙ্কা নিয়ে বাঁচতে বাঁচতে জীবনটাই একেবারে বর্ণহীন, ফিকে হয়ে গেছে।

আবার এই অর্পিতা কিছুক্ষেত্রে অন্যরূপে একেবারে আলাদা। তার সামান্য শরীর খারাপ হলে বা জ্বরজারি হলেও অস্থির হয়ে যায় অর্পিতা। ঘরসংসার সব ফেলে সারাক্ষণ তার কাছেই বসে থাকে। বারবার জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁ গো, কষ্ট হচ্ছে? মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে? কি হচ্ছে বল না! আমায় বল! কোনদিন অসুখের একটু বাড়াবাড়ি হলে বারবার কোন ডাক্তারকেও ব্যতিব্যস্ত করে তোলে সে। একেক সময় মনে হয় সুশান্তর বিবাহিত জীবনে মাতৃসত্ত্বা বেশী কাজ করলে কি স্ত্রী সত্ত্বা ধীরে ধীরে হারাতে থাকে? তাই বা কি করে হবে। যা কিছু সন্দেহ যা কিছু মান অভিমান নিয়ে সীন ক্রিয়েট, সে সব তো তার বধূ সত্ত্বারই বহিঃপ্রকাশ।

এমনই একদিনে বসন্তে বজ্রনির্ঘোষ ঘটেছিল। সোনাই-এর অ্যানুয়াল পরীক্ষার রেজল্ট বেরিয়েছে। আটাত্তর পার্সেন্ট নম্বর পাওয়ায় মেয়ের সাথে মা-বাবাও খুশী। মার্কসীট দেখতে দেখতে এলোমেলো কথাবার্তা চলছিল বসার ঘরে। এর মধ্যেই সাইকেলের বেলের শব্দ। হই হই করতে করতে ঘরে ঢোকে ডোরা। —

কাকিমা দেখ দেখ। আমি কিন্তু তিয়াত্তর পার্সেন্ট পেয়েছি বলে প্রণাম করতে যায় ডোরা অর্পিতাকে। —এই মেয়ে। বাধা দেয় অর্পিতা। অত প্রণাম করেনা। শোন, তুই যা খেতে ভালবাসিস আজ তাই রান্না করেছি। আজ খেয়েদেয়ে বন্ধুর সাথে আড্ডা মার। আর বাড়ী যেতে হবে না।—ওঃ ইউ আর গ্রেট কাকিমা। আমি ঠিক এটাই ভাবছিলাম। বাড়ীতে ফোন করে দিই তাহলে। —সে আর তোকে করতে হবে না। আমি আগেই করে দিয়েছি। বলে দিয়েছি তোর মাকে।

—হাউ সুইট। কাকিমা জিন্দাবাদ। সোনাই এসে আগেই বলেছিল। উচ্ছ্বাসে ভেঙ্গে পড়ে ডোরা। উত্তরে মৃদু হাসতে থাকে অর্পিতা। সুশান্ত এতক্ষণে নীরব দর্শক হয়েই ছিল।—তা ওর পছন্দের মেনু কি কি করেছ সেটা বল। আমিও তো আজকের ডিনারে নিমন্ত্রিত তাই না। সুশান্তও এই আনন্দের শরিক হতে চায়। অর্পিতার চোখে কৌতুক ঝিলিক মারে। —কি করিনি সেটাই বল। পরোটা, বোনলেস চিলিচিকেন, চানামশলা, মিষ্টি সবই আছে। ও হ্যাঁ পায়েসও আছে। ওদের গল্প করতে বলে জলখাবারের ব্যবস্থা করতে চলে যায়। সুশান্তর মন আনন্দে বাৎসল্যে দ্রব হয়ে উঠেছিল। একজন আত্মজা অপরজন তারই সাথী। সেও তার মেয়ের মতই। ডোরা আর সোনাই ভাল নম্বর পেয়ে পাশ করেছে—এর থেকে সুখের আর কি হতে পারে। আরও কিছুক্ষণ গল্প করে স্টাডিরুমে চলে এসেছিল সুশান্ত। ওরা নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করুক। মিশরীয় সভ্যতার আবিষ্কারের ওপর একটা খুব ইন্টারেস্টিং বই এনেছে গতকাল। সেটার ভিতরেই মনোনিবেশ করে একেবারে ডুবে গিয়েছিল। হঠাৎ দুটো হাত পিছন থেকে চোখ টিপে ধরেছিল। চমকে ওঠে সুশান্ত!—কে রে! খিলখিল হাসিতে ঝরণার মত হাজির ডোরা। বুঝতে পারনি তো! সোজা হয়ে বসে সুশান্ত। বুঝতে পারব না কিরে? তোকে কি আমি আজ থেকে দেখছি! সত্যি? একবারেই বুঝতে পেরেছ। শোন, বাবারা ছেলেমেয়েদের স্পর্শ ঠিকই বুঝতে পারে। তুই আর সোনাই তো আমার কাছে আলাদা নয়। কাকু জান, আমার খুব ইতিহাস পড়তে ইচ্ছা করে। হিসট্রির বিভিন্ন ব্যাপার আমাকে খুব টানে।—বেশতো, মাধ্যমিক পাশ কর। তারপর কম্পালসারি সাবজেক্ট হিসট্রি নিস। হ্যাঁ রে, সোনাই কোথায়? ওকে কাকিমা একটু দোকানে পাঠালো। চলে আসবে এখুনি। সেদিন সোনাই ফিরে না আসা পর্যন্ত অনেকক্ষণ সুশান্তর সাথে গল্প করেছিল ডোরা। মেয়েটাকে ভাল করে স্টাডি করে অবাক হয়েছিল সুশান্ত। আচরণে যতখানি ক্যাজুয়াল এ্যাপ্রোজ দেখায় আসলে ডোরা আদৌ তা নয়। এটুকু বয়সেই ইতিহাস বিষয়ক পড়াশুনা

যথেষ্টই করে ফেলেছে ও। এছাড়া পজিটিভ সাহিত্যিকদের ম্যাক্সিমাম রচনাই পড়ে ফেলেছে। এটা খুব ভাল লেগেছিল সুশান্তর। মাধ্যমিকের পরে হেল্প পাওয়ার প্রতিশ্রুতিতে খুশীতে উচ্ছল হয়েছিল ডোরা। এর মধ্যেও দু'একবার দরজার দিকে চোখ চলে যাচ্ছিল। সবকিছু আজ উৎসবের মেজাজে হলেও অমিত্রাক্ষর হতে আর কতক্ষণ! আজ অবশ্য নিশ্চিন্ত। অর্পিতা খুব ব্যস্ত রান্নাঘরের কাজে। বেশ খোসমেজাজেই খাবার টেবিলে বসে সুশান্ত। দুই কিশোরীই আজ উচ্ছল। ওদের সঙ্গে যোগ দিয়ে অর্পিতাকেও আজ যেন বেমানান লাগে। জীবনের মন্দাক্রান্তা ছন্দ আজ যেন লঘুসঙ্গীতের সুরে বেজে যাচ্ছিল। জানুয়ারীর বইমেলায় এবার সবাই একসাথে যাওয়া হবে। ডোরার মা-বাবাও যাবেন। মানে রাজী না হলেও জোর করে নিয়ে যাওয়া হবে।—ঠিক বলেছিস সোনাই। বলে ওঠে সুশান্ত। হঠাৎ কি হলো! তারপর কাজ করে অনুমান শক্তি। ডোরার সাথে কথাবার্তা বলার সময় নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছে অর্পিতা। কিন্তু কি করে করলো। একবারও তো আসেনি সেখানে। অবশ্য এও হতে পারে। এর মধ্যে সোনাই ফিরে আসতেই জিজ্ঞাসা করেছে অর্পিতা।

সোনাই হয়তো কিছু না ভেবেই বলেছে যে বাপী ডোরার সঙ্গে গল্প করছে। তাতেই নিশ্চয় ছন্দপতন হয়েছে। এত ভাল খাবারগুলো একনিমেষে বিস্বাদ হয়ে যায়। সুশান্ত কোনরকমে শেষ করার চেষ্টা করে খাওয়াটা। শোবার ঘরে ঢুকতেই শুরু হয়।—আজকাল তো কাউকেই বাদ দিচ্ছ না দেখছি। হ্যাঁ, এটার আশঙ্কাই করেছিল সুশান্ত।—ফাঁকা ঘরে বেশ ভালই জমেছিল, বল। মাথার মধ্যে হঠাৎই একটা আগুনের বল লাফ দিয়ে ওঠে সুশান্তর। সহ্যের একটা সীমা আছে প্রত্যেকের। ঠেলা খেয়ে খেয়ে একেবারে কিনারায় চলে গেলে নিরীহ বিড়ালও ফুঁসে ওঠে। চরম আঘাতে শেষ করে দিতে চায় আক্রমণকারীকে। সহসাই বন্যমার্জার হয়ে যায় সুশান্ত। বলিষ্ঠ বাহুর আঘাত আছড়ে পড়ে। আচমকা স্তব্ধ হয়ে যায় অর্পিতা। তার কাছে এটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত।—আর একটা কথা বললে একেবারে শেষ করে ফেলব। অনেক সহ্য করেছি। আর নয়। সোজা বিছানায় শুয়ে পড়েছিল সুশান্ত। তাকিয়েও দেখেনি তারপর। কখন এসে বিছানায় শুয়েছে অর্পিতা কে জানে। সোনাই বা ডোরা কেউ ঘুণাক্ষরে টের পায়নি এ ঘটনার। পরদিন যথারীতি যা হওয়ার সকালে উঠে সোজা বাপের বাড়ী অর্পিতা রাগে ক্ষোভে এবার সুশান্ত যায়নি ওদের বাড়ী। কতদিন ছিল যেন সে ওখানে? তা প্রায় দিন দশেক হবে। এর মধ্যে শাঁখের করাত হয়ে দাঁড়িয়েছিল

সোনাই-এর। মার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে খেঁকিয়ে উঠত সুশান্ত। স্বভাবের একেবারে উল্টো আচরণে বিস্মিত হলেও চুপ করে যেত সোনাই। নীরবে নিজের পড়াশুনো আর টুকটাক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকত।

আবার ত্রাতারূপে এগিয়ে এসেছিল সুশান্তর বড় শালী। প্রথমে বুঝিয়ে সুঝিয়ে পরে ধমকধামক দিয়ে অর্পিতাকে ফেরত পাঠিয়েছিল। সে দিন হয়তো অর্পিতার মনেও কিছুটা অনুতাপ জন্মেছিল। ফিরে এসে একেবারে স্বভাববিরুদ্ধ আচরণ করেছিল সে। এ কদিনের সংসারের বেহাল অবস্থার দিকে নজর রেখে তাড়াতাড়ি ঘরবাড়ীর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে দ্রুত গোছগাছের কাজে লেগে গিয়েছিল সে। একই মানুষের চরিত্রে ভিন্ন থেকে ভিন্নতর আবেগের প্রকাশে আগে অস্থির হোত সুশান্ত। তারপর দীর্ঘদিন ঘর করতে করতে অস্থিরতার বদলে জায়গা নিয়েছিল বিব্রতভাব। এখন আর কিছুই কাজ করেনা ওর মনের মধ্যে। আমার কপালটাই এরকম। সবই তাঁর ইচ্ছা। ঈশ্বরবিশ্বাসী ধর্মবিশ্বাসী সুশান্ত মেনে নিয়েছিল। বছরে অন্তত চার থেকে ছয় বার এই ঘটনা ঘটবে। কিছুদিনের জন্য আত্মীয় পরিজন থেকে সমাজ সংসার থেকে, ব্যঙ্গবিদ্রূপ বা সহানুভূতি শুনতে হবে। তবে বারবার ব্যবহারে তো ধারালো অস্ত্রেও মরচে পড়ে। ইদানিং বোধহয় সেটাই হয়েছে। একটা ব্যাপার শুধু ভেবে পায় না সে। অর্পিতা সাবেকিয়ানায় বেশ কিছুটা বিশ্বাসী। ঠাকুর রামকৃষ্ণ সম্বন্ধেও বেশ ভক্তিমতী। দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়মঠে যাওয়ার ব্যাপারে ওর আগ্রহ আছে। সবচেয়ে বড় কথা বিবেকানন্দ সম্পর্কে এবং স্বামীজির লেখা বইপত্রও অনেক পড়েছে। কলেজ ইউনিভারসিটির ডিগ্রি না থাকলেও এ বিষয়ে ওর আগ্রহ দেখে বেশ খুশীই হয়েছিল সুশান্ত। অর্পিতার সঙ্গে আলোচনা করে বিবেকানন্দ রচনাবলী এবং আরো কিছু এ সংক্রান্ত বই কিনে দিয়েছিল অর্পিতাকে। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আলোচনায় অর্পিতার স্টাডির গভীরতা মুগ্ধ করেছিল তাকে। এমনই এক সন্ধ্যায় আলোচনা হচ্ছিল তাদের মধ্যে। সুশান্ত বলছিল স্বামী বিবেকান্দের আরো অনেকদিন এ পৃথিবীতে থাকা উচিত ছিল।

সুশান্তের বড় বোন অর্থাৎ দিদির বিবাহ বেশ কয়েক বছর আগেই হয়ে গিয়েছে। সেই দিদি তার শ্বশুর বাড়ীতে ঘর সংসার নিয়ে সুখে আছেন। ছোট ভাই সবে গ্র্যাজুয়েশন পাশ করার পর একটা সওদাগরী অফিসে চাকুরীরত। ছোট বোন উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ করার পর বাড়ীর সকলে পাত্রস্থ করায় জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। কাগজের মাধ্যমে পাত্র যোগাড় হলো। সুশান্তর বাড়ীতে আনন্দের

ছাপ স্বাভাবিকভাবে পরিলক্ষিত হয়। সুশান্তের বাবা এবং মা অর্পিতাকে ডেকে বলে, ননদের বিয়ে তাই তোমাকেই দায়িত্ব নিয়ে সকল ব্যবস্থা করতে হবে। দেখে নাও কোথায় কি দরকার? রাত্রিতেই অর্পিতা সুশান্তকে এক ফর্দ ধরিয়ে দিয়ে বলে এই সমস্ত কেনাকাটা আমাকেই করতে হবে। তুমি দুই-একদিনের মধ্যে টাকাটা আমাকে দেবে। ননদকে বলে, তোমার বেনারসি আমিই তোমাকে নিয়ে গিয়ে কিনবো। বাড়ীর সকলে জানে অর্পিতার কোন কথার নড়চড় হওয়া মানে বাড়ীতে অশান্তি। তাই সে যে ভাবে চায় তার যেন কোন অন্যথা না হয় সেই দিকেই সকলের সজাগ দৃষ্টি। অর্পিতার কেনাকাটা শুরু হয়েছে। সুশান্ত ঠাট্টার ছলে বিয়ের কাপড় পছন্দ অপছন্দ সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করার সাথে সাথে অর্পিতার মান অভিমানের পালা বেড়ে যায়। শুধু রাত্রিতে খাওয়া দাওয়া বন্ধ নয়, এক কাণ্ড ও ঘটিয়ে বসে। বেশী রাত্রিতে একাটা গোঁ গোঁ আওয়াজে সুশান্তের হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়। জেগে দেখে অর্পিতার ভিতর যেন একটা অস্থিরতার ভাব। সঙ্গে সঙ্গে সুশান্ত বাড়ীর সকলকে জাগায় এবং ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসে। ততক্ষণ বাড়ীর লোকজনেরা দেখে অর্পিতার মুখ থেকে কেমন যেন সাদা সাদা লালা বেরোচ্ছে। ডাক্তার এসে বলে, পয়জেনাস কিছু খেয়েছে। এখনই ওয়াশ করে সেটা বের করে ফেলতে হবে, নইলে বাঁচানো শক্ত হবে। সাথে সাথে কাছেই একটা নার্সিংহোমে ভর্তি করে যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়। তারপরের দিনই বাড়ীতে আনা হয়। মৌসুমী বৌদির এসব আচরণে ক্ষুব্ধ। কিন্তু অর্পিতার প্রতি ভালবাসায় আর কোন খামতি নেই। তাই সে যথার্থ সেবার ত্রুটি রাখে না। বাড়ীর সকলেই জানে যে অর্পিতার কথার কোন নড়চড় হওয়া মানেই বাড়ীতে অশান্তি। তাই সে যা চায় তার যেন অন্যথা না হয় সেদিকে সবাই সজাগ দৃষ্টি রাখে। কার সামান্য কথা কখন যে কিভাবে নেবে কে জানে? বিয়ের কেনাকাটা অর্পিতা নিজেই করছে। এর মধ্যেই ঘটে গেল এক অপ্রীতিকর ঘটনা। বিয়ের শাড়ীর রং দেখে সুশান্ত একটা ঠাট্টা করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে অর্পিতা রাগ করে কেঁদেকেটে এক অনর্থ বাধিয়ে তোলে। সে দিনও রাতের খাবার খায় না। রাত তখন আন্দাজ দুটো হবে। হঠাৎ একটা গোঁ গোঁ আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে যায় সুশান্তর। তাড়াতাড়ি উঠে দেখে আওয়াজটা অর্পিতার দিক থেকেই আসছে। আলো জ্বালাতেই দেখা যায় বিছানায় ছটফট করছে অর্পিতা। মুখ থেকে সাদা সাদা লালা বেরোচ্ছে। সুশান্তর চিৎকারে উঠে পড়ে সবাই। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডেকে নিয়ে আনা হয়। তিনি দেখে বলেন, মনে হয় আবার

পয়জেনাস কিছু খেয়েছে। এখনি ওয়াশ করতে হবে। ডাক্তারবাবুর পরামর্শমত কাছের একটা নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয় অর্পিতাকে। সময়মত চিকিৎসার ফলে বেঁচে যায় সে। এ ঘটনায় তটস্থ হয়ে থাকে বাড়ীর সকলে। বাড়ীর সকলে এই কাণ্ডে একেবারে লজ্জা আর ক্ষুব্ধ। তা হলেও কিন্তু সেবাযত্নের ত্রুটি রাখে না কেউ। সুশান্তর ভাইবোনেরা সতর্ক থাকে। কোনভাবেই যেন একথা মৌসুমীর হবু শ্বশুরবাড়ীতে না পৌঁছায়। বিয়ের দিন কাছে এসে পড়েছে। অর্পিতার কিন্তু কোন হেলদোল নেই। যথারীতি মৌসুমীর ওপর নজরদারী চলেছে। সামনেই বিয়ের তারিখ। ছেলে পক্ষ যেন ঘুণাক্ষরেও এই সব জানতে না পারে। বাড়ীর সকলে খুবই চিন্তিত। আশীর্বাদ থেকে বিয়ে পর্যন্ত অর্পিতা কিন্তু কোন কাজে ত্রুটি রাখে না। কিন্তু মৌসুমীর ওপর নজরদারী ঠিকই চলেছে।

এরপর আপন গতিতে অচিন্ত্যবাবুর সংসারের চাকা ঘুরছে। সুশান্ত ও অর্পিতার দুই মেয়ে। সুশান্তর ছোট ভাই আর অর্পিতার দেওরের বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়। বৌদি দেওরের বিয়ের জন্য যা যা করণীয় সেই কাজে কোন ত্রুটি করছে না। বৌভাতের রাত্রিতে দেওর একটু ঠাট্টা করে কি বলেছে তার জন্য গোঁসা। সকলে মিলে বুঝাবার চেষ্টা করে দেওররা বৌদির সাথে এরূপ একটু আধটু করেই থাকে। তারপর দেওরই তার অভিমান ভাঙ্গায়।

অচিন্ত্যবাবুর ছোট ছেলের অফিস বাড়ী হতে অনেক দূরে হওয়াতে এবং খুব ভোরে বেরোতে হয় বলে অফিসের কাছাকাছি একটা বাড়ী ঠিক করে। স্বামী এবং স্ত্রী দু'জনেই ওখানে থাকে। রবিবার করে বাডীতে আসে।

সুশান্তর এবং অর্পিতার দুই মেয়ে ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠছে। অর্পিতা কিন্তু অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে মোটেই পিছপা হচ্ছে না। প্রায়ই মৌসুমীকে নিয়ে ঝগড়াঝাটি লেগে আছে। এই সব অগোচরে লক্ষ্য করেন সুশান্তের বাবা অচিন্ত্যবাবু। একদিন বৌমাকে ডেকে বলেন। অর্পিতা, দেখ আমাদের তো বয়স হয়েছে। সব সময় তোমার শ্বাশুড়ী ঘরের সব কিছু কাজ গুছিয়ে উঠতে পারে না, এমনকি আমাদের ঔষধটুকু সময় মত খাওয়া হয় না। মৌসুমী কাল থেকে আমাদের ঘরেই থাকবে। তুমিও দেখ বৌমা তোমার কোন অসুবিধা হবে না তো?

না বাবা সে তো ভাল কথা। এই কথাটা তো আমি আপনাকে বলবো বলে ঠিক করেছিলাম। কিন্তু জানেন বাবা, মৌসুমী মেয়েটা যথেষ্ঠ কাজ করে বটে— তবে ওর চাল-চলন আমার মোটেই ভাল লাগে না। অচিন্ত্যবাবু শুধু চুপ করে

শোনেন। পরের দিন থেকে তাই কার্যকরী হলো। দুই মেয়েই মায়ের এই আচরণে বেশ ক্ষুব্ধ হয়। তবে চুপ করে থাকে।

এর মধ্যেই একে একে দুই মেয়েকেই সুশান্ত এবং অর্পিতা পাত্রস্থ করে ফেললো। সংসার এতদিন দুই মেয়ে অনেকটা সামলিয়েছে। অর্পিতা এই দু'জন সংসারের সংসার চালাতে হিমসিম খাচ্ছে। তদুপরি দু'জনের কারো শরীর ভাল যাচ্ছে না। সুশান্ত এখন অবরসপ্রাপ্ত। অর্পিতার মর্জি মাফিক সুশান্ত মাঝে মধ্যে কোথাও না কোথাও বেড়াতে যায়।

একদিন অর্পিতা অসুস্থ হওয়ায় অচিন্ত্যবাবু মৌসুমীকে বলেন সুশান্ত এবং অর্পিতার ঘরে সংসারের কাজ দেখভাল করতে। মৌসুমীকে কিন্তু কোন কাজের কথা বলতে হয় না। বহুদিন যাবৎ সে এই সংসারের সবকিছুর সঙ্গেই পরিচিত। যেন নিজের সংসার। কেউ বাড়ীতে না থাকলেও আত্মীয় পরিজনদের কিভাবে আদর আপ্যায়ন করতে হয় সবই ওর জানা। এহেন একটি মেয়ের প্রতি অযথা সন্দেহ বাতিক খুবই পরিতাপজনক। এর মধ্যে কয়েকবার অসুস্থতার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে অর্পিতা আর সুশান্তকে। এই সময় দু'জনের দেখাশোনার ভার পুরোপুরি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে মৌসুমী। সময় মত বাড়ী হতে খাবার পৌঁছানো। ঔষুধের ব্যবস্থা করা—সবই। মাঝে মাঝে মেয়েরা আসে দুই-একদিনের জন্য। মৌসুমীকেও সুশান্তের সেবা শুশ্রূষার ব্যাপারে অতি সন্তর্পণে এগোতে হয় পাছে অর্পিতা কিছু বলে ফেলে। হয়েছেও কয়েকবার। অর্পিতা, যা তোর দাদাকে ভাল করে দেখ। দেখিস, লোকটা মরে না যায়। আমার থেকে তোর দাদাকে দেখা বেশী প্রয়োজন।

পৈতৃক বাড়ীতে এখন সুশান্ত আর অর্পিতা। আর এদের দু'জেনর মাঝে রয়েছে ভাগ্যহীনা মৌসুমী। পাঁচ বৎসর আগে সুশান্তের বাবা এবং তার তিন বৎসর পরে মা এই সংসারের মায়া বন্ধন মুক্ত করে চলে গেছেন। দু'জনের শরীর যখন ভাল যাচ্ছে না তাই একদিন অর্পিতা এক গনৎকারের কাছে যায় জানতে যে আগে পরে কার যাওয়ার সম্ভাবনা। গনৎকার হাত দেখে এবং আনুষঙ্গিক সব জেনে বলে—আপনার স্বামী আগে যাবেন এবং তার বেশ কিছুদিন পরে আপনার ভাগ্য। তবে মঙ্গলের জন্য কিছু বিধান দেন বাড়ীতে বসে করার জন্য। তার জন্য যথাযথ অর্ডারপত্র দেওয়া হয়।

এদিকে সুশান্ত দিনের পর দিন আরো বেশী অসুস্থ হয়ে পড়ছে। নানাভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে যাতে সে সুস্থ হয়ে ওঠে। আত্মীয় স্বজন সকলে খুব

চিন্তিত। মৌসুমীর ভূমিকার কোন ত্রুটি নেই। অর্পিতার অনেক কিছু কাজই সে করে দেয় কারণ শরীরও তো খুব একটা ভাল নেই। চিন্তা হয় সে আবার বেশী অসুস্থ না হয়ে পড়ে।

কয়েকদিনের মধ্যেই রাতে যথারীতি তিনজনে ডাইনিং টেবিলে খাওয়া দাওয়া করছে। অসুস্থ সুশান্তকে দু'টুকরো মাছ দেওয়া হয়েছে। সে অন্যান্য পদ সহ দু'টুকরো মাছ খেতে মোটেই রাজী নয়। অর্পিতাকে বলে এক টুকরো মাছ নিয়ে নিতে। অর্পিতা মোটেই রাজী নয়। সুশান্ত তখন একটুকরো মাছ মৌসুমীর পাতে দিয়ে দেয়। অর্পিতা রেগে গিয়ে পুরো না খেয়ে উঠে পড়ে।

সাধারণতঃ খাবার পরে তিনজনে মিলে টেলিভিশান দেখে। আজও অর্পিতা একটু আগে এসেই টেলিভিশনের সামনে বসে পড়েছে। পরেই এক এক করে সুশান্ত এবং মৌসুমী এসে বসেছে। সুশান্ত একটু ঠাট্টা তামাসার গল্পও করে। রাত্রি একটু বাড়ার সাথে সাথে প্রথমেই নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে অর্পিতা। তারপরে অর্পিতার পাশে শুয়ে পড়ে মৌসুমী। অন্য ঘরে একটা পালঙ্কে নিজের শয্যা নেয় সুশান্ত। মৌসুমী শুতে যাওয়ার আগে সুশান্তের রাত্রিতে খাওয়ার ঔষুধ তাকে দিয়ে যায়।

এখানেই নারী চরিত্রের ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারে না। তার মন কি চায়? কেনই বা তার চায়? যা ঘটেছিল অর্পিতার বেলায়। হঠাৎ গভীর রাত্রে একটা চিৎকার। মৌসুমী! মৌসুমী! নির্জন এই বাড়ীতে একদিকে শুয়ে আছে সুশান্ত অন্য পাশের ঘরে তখন একা শুয়ে আছে মৌসুমী। এই চিৎকারে হঠাৎ উঠে মৌসুমী ভাবে—সে একা কেন? পাশে বৌদি কোথায়? আবার সেই চিৎকার। পাশের বাড়ীর লোকজন ততক্ষণে এসে গেছে। মৌসুমী দরজা হতে বেরিয়ে দেখে অন্য ঘর থেকে প্রচুর ধোঁয়া বেরোচ্ছে। তাড়াতাড়ি বের হতে জানলাব কপাটে ধাক্কা মারতে খুলে যায়। পিছনের দিকে ছেলেরা মিলে দরজা ভেঙে ফেলে। ঘরের ভিতর এক বীভৎস দৃশ্য। অর্পিতা দাউ দাউ করে জ্বলছে তার সাথে আর্তনাদ মৌসুমী! মৌসুমী! মৌসুমী চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। বৌদি একি তুমি করলে! সামনে পড়ে আছে কেরোসিনের একটা বোতল আর তারই কাছে পড়ে আছে একটা দেশলাইয়ের বাক্স।

সুশান্ত এসব দেখে শুনে একেবারেই স্তব্ধ। শুধু বলে, এ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এসো। এখনই হাসপাতালে নিয়ে যাও। সে এক বীভৎস চেহারা নিয়ে আর্তনাদ। বাঁচবার ইচ্ছা থাকলেও আত্মাভিমানি অর্পিতার বাঁচার উপায় নেই। শরীরের

আশি ভাগ অংশই পোড়া।

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধ বেগাঃ
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা—
স্তবপি রক্তনি সমৃদ্ধ বেগাঃ

হাসপাতালেই পরের দিন গভীর রাত্রে অর্পিতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। হাসপাতাল থেকেই পুলিশে ডায়েরী হয়েছিল। অনেক তদ্বিরতদারকের পর মৃতদেহ বাড়ীতে নিয়ে আসা হলো।

বাড়ীতে এবং পাড়ায় শোকের ছায়া নেমে এলো। বাড়ীতে একাধারে অর্পিতার মৃতদেহ। অন্যদিকে স্থানীয় থানা থেকে পুলিশ এসেছে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। সুশান্ত আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। পাড়ার লোকেরা এবং আত্মীয় স্বজনরা বলাবলি করছে—স্বামীর শরীরের এই অবস্থা। একটুও মায়া দয়া হলো না। স্বার্থপরের মত এই ভাবে কেউ ফেলে যায়? সুশান্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অর্পিতার মরদেহের কাছে দাঁড়ালো এবং শুধু বলল—প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াহর্সি দেব সোঢুম্।

মৌসুমী কিন্তু এতক্ষণ অর্পিতার সৎকারের জন্য প্রয়োজনীয় সব কাজকর্ম করে যাচ্ছিল। এর পর পাড়াপড়শী যখন মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছে মৌসুমী তখন মানসিক ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে সজোরে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। বৌদি, বৌদি, করে চীৎকার করে। তুমি আমাকে একা ফেলে চলে গেলে। মেয়ের প্রতি তোমার একটুও মায়া মমতা রাখলে না।

কয়েকদিন আগে দু'জনেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তখন অর্পিতাই সুশান্তকে বলেছিল, দেখ আমরা দু'জনেই চলে গেলে মৌসুমীকে কে দেখবে! সুশান্তই তখন মৌসুমীর জন্য দু-একটা পাত্র দেখাশুনা আরম্ভ করেছিল। অসুস্থতার কারণে এরপর সব বন্ধ ছিল। মৌসুমীকে পাত্রস্থ করতে সুশান্তর বাবা এবং মা ওর নামে বেশ কিছু টাকা এবং গহনা রেখে গিয়েছেন। ওরা ছেলে মেয়ে এবং বৌমাদের বলেও ছিলেন তাঁদের অবর্তমানে মৌসুমীকে একটা ভাল পাত্র দেখে বিবাহ দিও।

সুশান্ত কিন্তু এবার ছ'ড়বার পাত্র নয়। সে অসুস্থ শরীর নিয়েই উঠে পড়ে লেগেছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মৌসুমীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে। আগে যাদের সাথে অনেকটা কথাবার্তা এগিয়েছিল সেই পাত্র এবং বাড়ীর লোকজন

এসে উপস্থিত। তাদের মেয়েকে পছন্দ। ছেলে একটি সওদাগরী অফিসে কাজ করে। ছেলেটিকে মৌসুমীর কোন অপছন্দের কারণ ছিল না। ছেলে পক্ষের সাথে মোটামুটি কথাবার্তা পরিষ্কার, এবার শুধু দিন ঠিক করা। মৌসুমীর একটু আপত্তি এই যে, ওর বিয়ে হয়ে গেলে দাদাকে কে দেখাশুনা করবে? সুশান্তর মেয়েদের পক্ষে বরাবরের জন্য থাকা সম্ভব নয়। উভয়েরই ঘর সংসার আছে।

হঠাৎ একদিন রাত্রে সুশান্ত খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। ডাক্তার ডাকা হলো। অক্সিজেন, স্যালাইন কিছুই দেওয়া যাচ্ছে না। দেখতে দেখতে সেই রাত্রিতেই সুশান্ত শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে। পরের দিন সকালে আত্মীয়স্বজনার এসে হাজির। সুশান্তের ছোট ভাই প্রশান্ত এখন অনেকটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। সংসারের এক এক করে সবাই চলে গেল। এত বড় বাড়ী লোকশূন্য। যথাসময়ে শ্রাদ্ধের কাজকর্ম মিটে গেল।

হতভাগ্য মৌসুমী। সব সময় কান্নাকাটি ছাড়া তার আর কিই বা আছে। মৌসুমীর ভাবি শ্বশুর বাড়ীর সকলেই এসেছে দেখা করতে। প্রশান্ত বাড়ীতেই ছিল। সে আজ ওদের সাথে একটা পাকা বোঝাপড়া করার জন্য উদ্‌গ্রীব। সবাই মিলে বসে বিয়ের দিন ঠিক হলো। এও ঠিক হলো মৌসুমীর বিয়ের পর ওরা আপাততঃ এই বাড়ীতেই একখানা ঘর নিয়ে থাকবে। যতক্ষণ না বাড়ীর ব্যাপারে একটা ফয়সালা হয়। এই বাড়ীতেই বিয়ের আয়োজন হবে। উভয় পক্ষেই রাজী।

প্রশান্ত এবং আত্মীয়-স্বজনরা মৌসুমীকে বলল—তোমার যা যা দরকার তুমি নিজেই দেখে শুনে নেবে। মৌসুমীকে সবাই এই বাড়ীর মেয়ে হিসাবেই দেখে, কাজেই আত্মীয়-স্বজনরা প্রত্যেকে এগিয়ে আসে বিয়ের ব্যাপারে তাদের কর্তব্যে কোন ত্রুটি করে নি। লোকজনের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা প্রশান্তের তত্ত্বধানেই হয়। বরযাত্রী এবং নিমন্ত্রিত অতিথিরা সকলেই খুব খুশী। বড়দের আশীর্বাদ এবং ভাগ্যের হাত ধরে আজ এই বাড়ীতে নবজীবনে প্রবেশ করে দুটি প্রাণ। একজন এই বাড়ীরই চিরপরিচিত মৌসুমী আর আরেকজন তার স্বামী অনিমেষ। মৌসুমীর বিবাহিত জীবন সুন্দর এক নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠার দিকে এগিয়ে চলল।

—